অমৃত-দ্বীপ

হেমেন্দ্রকুমার রায়

BENGALIEBOOK.COM
2021

অমৃত-দ্বীপ

গোড়াপত্তন

গোড়ায় একটুখানি গৌরচন্দ্রিকার দরকার। যদিও অমৃত-দ্বীপ নতুন উপন্যাস, তবু এর কাহিনি আরম্ভ হয়েছে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন নামে উপন্যাস থেকে। বিমল, কুমার, জয়ন্ত, মানিক ও ইনস্পেকটর সুন্দরবাবু কয়েকটি রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের তদ্বিরে নিযুক্ত হয়ে তাও ধর্মমতের প্রবর্তক প্রাচীন চিনা সাধক লাউ-জুর জেড পাথরে গড়া একটি ছোট প্রতিমূর্তি এবং অমৃত-দ্বীপে যাওয়ার একখানি ম্যাপ হস্তগত করে। খ্রিস্ট জন্মাবার ছয়শত চার বৎসর আগে চিনদেশে লাউ-জুর আবির্ভাব হয়।

চিনদেশের প্রাচীন পুথিপত্রে প্রকাশ, তাও সাধুদের মতে, প্রশান্ত মহাসাগরে একটি দ্বীপ আছে, তার নাম অমৃত-দ্বীপ। সেখানে সিয়েন অর্থাৎ অমররা বাস করে। সেখানে অমর লতা জন্মায়, তার অমৃত-ফল ভক্ষণ করলে মানুষও অমর হয়। যারা তাও ধর্ম গ্রহণ করে তাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, অমৃত-দ্বীপে যাওয়া। আর, সেখানে গেলে লাউ-জুর মন্ত্রপূত প্রতিমূর্তি সঙ্গে থাকা চাই।

বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের মতন তাও-ধর্মও পরের যুগে ভিন্ন রূপ ধারণ করে। তার মধ্যে ক্রমেই ভূত-প্রেত, মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়-ফুক আর হরেক রকম ম্যাজিকের আবির্ভাব হয়। তাও সাধকরা বলে, তাদের সিদ্ধপুরুষরা কেবল অমরই হয় না, জলে-স্থলে-শূন্যে তাদের গতি হয় অবাধ।

আধুনিক যুগে এ-সব কথা বিশ্বাসযোগ্য নয় বটে, কিন্তু চিনাদের পবিত্র পাহাড় থাইসানে-র তলদেশে অবস্থিত থাইআনফু মন্দিরে গিয়ে এক সমাধিমগ্ন তাও সিদ্ধপুরুষকে দেখে রিচার্ড উইলহেলম্ নামে এক জার্মান সাহেব সবিস্ময়ে লিখেছেন, এই সমাধিস্থ তাও সাধক মৌনব্রতী। তিনি কতকাল খাদ্য আর পানীয় গ্রহণ করেননি। বাইরের কোনও কিছুই তার ধ্যান ভঙ্গ করতে পারে না। তার দেহ শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে গেছে, দেখতেও তাকে মড়ার

মতো, কিন্তু তার দেহ সম্পূর্ণ তাজা, একটুও পচে যায়নি। (The Soul of China নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

অমৃত দ্বীপের পাঠকদের পক্ষে এইটুকু তথ্যই যথেষ্ট। যাঁদের আরও কিছু জানবার আগ্রহ আছে তারা ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন পড়ে দেখবেন।

.

প্রথম পরিচ্ছেদ। শত্রুর ওপরে শত্রু

জাহাজ ভেসেছে নীল জলে। এ জাহাজ একেবারেই তাদের নিজস্ব। অমৃত-দ্বীপে যাওয়ার সমস্ত জলপথটাই তাদের ম্যাপে আঁকা ছিল। সেই ম্যাপ দেখেই বোঝা যায়, কোনও বাণিজ্য-তরী বা যাত্রী-জাহাজই ও-দ্বীপে গিয়ে লাগে না, চার্টে ও-দ্বীপের কোনও উল্লেখই নেই।

কাজেই বিমল ও কুমারের প্রস্তাবে একখানা গোটা জাহাজই চার্টার বা ভাড়া করা হয়েছে। এটাও তাদের পক্ষে নতুন নয়। কারণ এইরকম একখানা গোটা জাহাজ ভাড়া করেই তারা আর একবার লিস্ট আটলান্টিস্-কে পুনরাবিষ্কার করেছিল। (নীলসায়রের অচিন পুরে নামক উপন্যাস দ্রষ্টব্য।)।

জয়ন্ত, মানিক ও সুন্দরবাবুর এ অভিযানে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না। বিমল ও কুমার একরকম জোর করেই তাদের সঙ্গে টেনে এনেছে।

কাজে কাজেই তাদের পুরাতন ভৃত্য ও দস্তুরমতো অভিভাবক রামহরিও যথেষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করেও অন্যান্য বারের মতো এবারেও শেষপর্যন্ত সঙ্গ নিতে ছাড়েনি।

এবং এমন ক্ষেত্রে তাদের চির-অনুগত চতুষ্পদ যোদ্ধা বাঘাও যে সঙ্গে-সঙ্গে লাঙুল আস্ফালন করে আসতে ছাড়বে না, সেকথা বলাই বাহুল্য।

তাদের পুরাতন দলের মধ্যে কেবল বিনয়বাবু আর কমলকে এবারে সঙ্গীরূপে পাওয়া গেল না। বিনয়বাবু এখন ম্যালেরিয়ার তাড়নায় কুইনিন ও আদার কুচির সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত এবং কমল দেবে এবার মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষা।

জাহাজখানির নাম লিটল ম্যাজেস্টিক। আকারে ছোট হলেও যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে এর মধ্যে চমৎকার সাজানো-গোছানো লাউঞ্জ ডাইনিং সেলুন, প্রমেনেড ডেক ও পাম কোট প্রভৃতিরও অভাব ছিল না। এরকম জাহাজ চার্টার করা বহুব্যয়সাধ্য বটে, কিন্তু বিমল ও কুমার যে অত্যন্ত ধনবান একথা সকলেই জানেন। তার ওপরে জয়ন্তও বিনা পয়সার অতিথি হতে রাজি হয়নি এবং সে-ও রীতিমতো ধনী ব্যক্তি।

জাহাজ তখন টুংহাই বা পূর্বসাগর প্রায় পার হয়ে রিউ-কিউ দ্বীপপুঞ্জের কাছ দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

ওপরে, নীচে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে কেবল অনন্ত নীলিমা কাছে চঞ্চল, দূরে প্রশান্ত।

এই নীলিমার জগতে এখন নতুন বর্ণ সৃষ্টি করছে নিম্নে শুধু শুভ্র ফেনার মালা এবং শুন্যে শুভ্র সাগর-বিহঙ্গের দল। প্রকৃতির রঙের ডালায় এখন আর কোনও রং নেই।

প্রাকৃতিক সংগীতেও এখানে নব-নব রাগিণীর ঝংকার নেই। না আছে উচ্ছ্বসিত শ্যামলতার মর্মর, না আছে গীতকারী পাখিদের সুরের খেলা, বইছে কেবল হু-হু শব্দে বাতাস এবং জাগছে কেবল আদিম সাগরের উচ্ছল কলকল মন্ত্র–এ দুই ধ্বনির সৃষ্টি পৃথিবীর প্রথম যুগে, যখন সবুজ গাছ আর গানের পাখির জন্মই হয়নি।

খোলা 'প্রমেনেড ডেকে'-র ওপরে পায়চারি করতে করতে মানিক বলল, আমাদের সমুদ্র যাত্রা শেষ হতে আরও কত দেরি বিমলবাবু?

বিমল বললে, আর বেশি দেরি নেই। চার ভাগ পথের তিন ভাগই আমরা পার হয়ে এসেছি। ম্যাপখানা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। আরও কিছু দূর এগুলেই বোনি দ্বীপপুঞ্জের

কাছে গিয়ে পড়ব। তাদের বাঁয়ে রেখে আমাদের অগ্রসর হতে হবে প্রায় পূর্ব-দক্ষিণ দিকে। তারপরই অমৃত-দ্বীপ।

মানিক বললে, দ্বীপটি নিশ্চয়ই বড় নয়। কারণ তাহলে নাবিকদের চার্টে তার উল্লেখ থাকত। এখানকার সমুদ্রে এমন অজানা ছোট-ছোট দ্বীপ দেখছি তো অসংখ্য। অমৃত-দ্বীপকে আপনি চিনবেন কেমন করে?

ম্যাপে অমৃত-দ্বীপের ছোট্ট একটা নকশা আছে, আপনি কি ভালো করে দেখেননি? সে দ্বীপের প্রথম বিশেষত্ব হচ্ছে, তার চারিপাশই পাহাড় দিয়ে ঘেরা পাহাড় কোথাও কোথাও দেড়-দুই হাজার ফুট উঁচু। তার দ্বিতীয় বিশেষত্ব, দ্বীপের ঠিক উত্তর-পশ্চিম কোণে পাহাড়ের ওপরে আছে ঠিক পাশাপাশি পাঁচটি শিখর। সবচেয়ে উঁচু শিখরের উচ্চতা দুই হাজার তিনশো ফুট। এরকম দ্বীপ দূর থেকে দেখলেও চেনা শক্ত হবে না। বলেই ফিরে দাঁড়িয়ে বিমল চোখে দুরবিন লাগিয়ে সমুদ্রের পশ্চিম দিকে তাকিয়ে কি দেখতে লাগল।

সুন্দরবাবু বললেন, হুম! আচ্ছা বিমলবাবু, আমরা যাচ্ছি তো পূর্বদিকে! অথচ আজ কদিন ধরেই লক্ষ করছি, আপনি যখন-তখন চোখে দূরবিন লাগিয়ে পশ্চিম দিকে কি যেন দেখবার চেষ্টা করছেন। এর মানে কী?

জয়ন্ত এতক্ষণ পরে মুখ খুলে বললে, এর মানে আমি আপনাকে বলতে পারি। বিমলবাবু দেখছেন আমাদের পেছনে কোনও শত্রুজাহাজ আসছে কি না!

এখানে আবার শত্রু আসবে কে?

কেন, কলকাতাকে যারা ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন দেখিয়েছিল, আপনি এরই মধ্যে তাদের কথা ভুলে গেলেন নাকি?

কী যে বলো তার ঠিক নেই! সে দল তো ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে!

কেমন করে জানলেন?

পালের গোদা কুপোকাত হলে দল কি আর থাকে?

দূরবিন নামিয়ে বিমল বললে, আমার বিশ্বাস অন্য রকম। সে দলের প্রত্যেক লোকই মরিয়া, তারা সকলেই অমৃত-দ্বীপে যাওয়ার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু ও-দ্বীপের ঠিকানা তারা জানে না, কারণ ম্যাপখানা আছে আমাদের হাতে। আমরা যে তাদের দেশের কাছ দিয়ে অমৃত দ্বীপে যাত্রা করেছি, নিশ্চয়ই এ-সন্ধান তারা রাখে। যারা লাউ-জুর মূর্তি আর ওই ম্যাপের লোভে সুদূর চিন থেকে বাংলাদেশে হানা দিতে পেরেছিল তারা যে আর একবার শেষচেষ্টা করে দেখবে না, একথা আমার মনে হয় না।

সুন্দরবাবু বললেন, হুম, শেষচেষ্টা মানে? আপনি কি বলতে চান, তাহলে জাহাজের সঙ্গে আমাদের জলযুদ্ধ হবে?

আশ্চর্য নয়।

সুন্দরবাবু বিস্ফারিত চক্ষে ও উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, আশ্চর্য নয় মানে? জলযুদ্ধ অমনি হলেই হল? আমাদের সেপাই কোথায়? কামান কোথায়? আমরা ঘুসি ছুঁড়ে লড়াই করব নাকি?

কুমার হেসে বললে, কামান নাই বা রইল, আমাদের সকলেরই হাতে আছে অটোমেটিক বন্দুক। আর আমাদের সেপাই হচ্ছি আমরাই।

সুন্দরবাবু অধিকতর উত্তেজিত হয়ে আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ বিকট স্বরে হুম শব্দ করে মস্ত এক লাফ মেরে পাঁচ হাত তফাতে গিয়ে পড়লেন।

মানিক বললে, কী হল সুন্দরবাবু, কী হল? আপনার হুঁড়িটা কি ফট করে ফেটে গেল?

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, যাও, যাও! দেখতে যেন পাওনি, আবার ন্যাকামি করা হচ্ছে! কুমারবাবু, আপনার ওই হতচ্ছাড়া কুকুরটাকে এবার থেকে শিকল দিয়ে বেঁধে

রাখবেন। আমাকে দেখলেই ও-বেটা কোত্থেকে ছুটে এসে ফোঁশ করে আমার পায়ের ওপরে নিশ্বাস ফেলে কি শোঁকে, বলতে পারেন মশাই?

মানিক বললে, আপনার পাদপদ্মের গন্ধ বাঘার বোধহয় ভালো লাগে।

ইয়ার্কি কোরো না মানিক, তোমার ইয়ার্কি বাঘার ব্যবহারের চেয়েও অভদ্র। ওই নেড়ে কুত্তাটাকে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না, চললুম আমি এখান থেকে।

সুন্দরবাবু লম্বা-লম্বা পা ফেলে অদৃশ্য হলেন, বাঘা বিলক্ষণ অপ্রতিভভাবে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। এ-লোকটি যে তাকে দু-চোখে দেখতে পারে না, এটা সে খুবই বোঝে। তাই বাঘার কৌতূহল হয়, সুন্দরবাবুকে কাছে পেলেই সে তার পা শুঁকে দেখে। মানুষের চরিত্র পরীক্ষা করবার এর চেয়ে ভদ্র উপায় পৃথিবীর কোনও কুকুরই জানে না।

*

পরদিন প্রভাতে ব্রেকফাস্টে-র পর বিমল ও কুমার জাহাজের ডেকে উঠে গেল। জয়ন্ত লেবলাঁকের লেখা একখানা ডিটেকটিভ উপন্যাস নিয়ে লাউঞ্জে গিয়ে আরাম করে বসল, মানিকও তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে।

সুন্দরবাবু বিরক্তি ভরে বললেন, জাহাজে উঠে পর্যন্ত দেখছি, বিমলবাবু আর কুমারবাবু অদৃশ্য শত্রুর কাল্পনিক ছায়া দেখবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত, আর তোমরা গাঁজাখুরি ডিটেকটিভের গল্প নিয়েই বিভোর! কারুর সঙ্গে দুটো প্রাণের কথা বলবার ফাঁক নেই!

জয়ন্ত জবাব দিলে না। মানিক বললে, আচ্ছা, এই রইল আমার বই! এখন প্রকাশ করুন আপনার প্রাণের কথা।

সুন্দরবাবু নিম্নস্বরে বললেন, কথাটা কি জানো? এই অমৃত-দ্বীপ, অমর-লতা, জলে স্থলে-শূন্যে চিরজীবী মানুষের অবাধ গতি, এসব কি তুমি বিশ্বাস করো ভায়া?

আমার কথা ছেড়ে দিন। আগে বলুন, আপনার কি মত?

হুম, আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে! বিমল আর কুমারবাবুর মাথায় তোমাদেরও চেয়ে বোধহয় বেশি ছিট আছে!–বলেই সুন্দরবাবু ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

হঠাৎ অমন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কেন?

কি জানো ভায়া, প্রথমটা আমার কিঞ্চিৎ লোভ হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে, সবই ভুয়ো! যা নয় তাই!

কীসের লোভ সুন্দরবাবু?

ওই অমর-লতার লোভ আর কি! ভেবেছিলুম দু-একটা অমৃত-ফল খেয়ে যমকে কলা দেখাব। কিন্তু এখন যতই ভেবে দেখছি ততই হতাশ হয়ে পড়ছি। আমরা ছুটেছি মরীচিৎকার। পেছনে, কেবল কাদা ঘেঁটেই ফিরে আসতে হবে।

তাহলে আপনি কেবল অমর হওয়ার লোভেই বিমলবাবুদের অতিথি হয়েছেন?

না বলি আর কেমন করে? অমর হতে কে না চায়?

অমর হওয়ার বিপদ কত জানেন?

বিপদ।

হ্যাঁ। দু-একটার কথা বলি শুনুন। ধরুন, আপনি অমর হয়েছেন। তারপর কুমারবাবুর কুকুর বাঘা হঠাৎ পাগলা হয়ে গিয়ে আপনাকে কামড়ে দিল। তখন কি হবে?

হুম, কি আবার হবে? আমি হাইড্রোফোবিয়া রোগের চিকিৎসা করাব!

চিকিৎসায় রোগ যদি না সারে, তাহলে? আপনি অমর, সুতরাং মরবেন না। কিন্তু সারাজীবন-অর্থাৎ অনন্তকাল আপনাকে ওই বিষম রোগের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ সারাজীবন চেঁচিয়ে মরতে হবে পাগলা কুকুরের মতন ঘেউ-ঘেউ করে!

তাই তো হে, এসব কথা তো আমি ভেবে দেখিনি!

তারপর শুনুন। আপনি অমর হলেও আপনার দেহ বোধকরি অস্ত্রে অকাট্য হবে না। কেউ যদি খাঁড়া দিয়ে আপনার গলায় এক কোপ বসিয়ে দেয়, তাহলে কি মুশকিল হতে পারে ভেবে দেখেছেন কি? আপনি অমর। অতএব হয় আপনার মুণ্ড, নয় আপনার দেহ, নয়তো ও-দুটোই চিরকাল বেঁচে থাকবে। কিন্তু সেই কন্ধকাটা দেহ আর দেহহীন মুণ্ড নিয়ে আপনি অমরতার কি সুখ ভোগ করবেন?

মানিক, তুমি কি ঠাট্টা করছ?

মোটেই নয়। অমর হওয়ার আরও সব বিপদের কথা শুনতে চান?

না, শুনতে চাই না। তুমি বড্ড মন খারাপ করে দাও। অমৃত-ফল পেলেও আমি আর খেতে পারব কিনা সন্দেহ।

জয়ন্ত এতক্ষণ কেতাবের আড়ালে মুখ লুকিয়ে হাসছিল। এখন কেতাব সরিয়ে বলল, সুন্দরবাবু, অমৃত-দ্বীপের কথা হয়তো রূপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আজকের শুকনো বৈজ্ঞানিক জগতে সরস রূপকথার বড়ই অভাব হয়েছে। সেই অভাব পূরণের কৌতূহলেই আমরা বেরিয়েছি অমৃত-দ্বীপের সন্ধানে। সুতরাং অমর-লতা না পেলেও আমরা দুঃখিত হব না। অন্তত যে-কদিন পারি রূপকথার রঙিন কল্পনায় মনকে স্নিগ্ধ করে তোলবার অবকাশ তো পাব। আর ওরই মধ্যে থাকবে যেটুকু অ্যাডভেঞ্চার, সেটুকুকে মস্ত লাভ বলেই মনে করব!

এমন সময়ে একজন নাবিক এসে খবর দিল, বিমল সবাইকে এখনি ডেকের ওপরে যেতে বলেছে।

সকলে ওপরে গিয়ে দেখলে, ডেকের রেলিংয়ের ওপরে ঝুঁকে বিমল দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার চোখে দূরবিন।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, বিমলবাবু কি আমাদের ডেকেছেন?

বিমল ফিরে বললে, হ্যাঁ জয়ন্তবাবু! পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখুন।

পশ্চিম দিকে চেয়েই জয়ন্ত দেখতে পেলে, একখানা জাহাজ তাদের দিকে বেগে এগিয়ে আসছে।

বিমল বললে, আমি খুব ভোরবেলা থেকেই ও-জাহাজখানাকে লক্ষ করছি। প্রথমটা ওর ওপরে আমার সন্দেহ হয়নি। কিন্তু তারপরে বেশ বুঝলুম, ও আসছে আমাদেরই পেছনে। জানেন তো, এখানকার সমুদ্রে চিনে-বোম্বেটেদের কীরকম উৎপাত! খুব সম্ভব, আমাদের শত্রুরা কোনও বোম্বেটে জাহাজের আশ্রয় নিয়েছে। দূরবিন দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ও-জাহাজখানায় লোক আছে অনেক-আর অনেকেরই হাতে রয়েছে বন্দুক। আমাদের কাপ্তেন-সায়েবের সঙ্গে আমি আর কুমার পরামর্শ করেছি। কাপ্তেন বললেন, জলে ওরা আক্রমণ করলে আমাদের পক্ষে আত্মরক্ষা করা সহজ হবে না।

তাহলে উপায়?

দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে দেখুন।

দক্ষিণ দিকে মাইল দুয়েক তফাতে রয়েছে ছোট্ট একটি তরুশ্যামল দ্বীপ।

আমরা আপাতত ওই দ্বীপের দিকেই যাচ্ছি। আশাকরি শত্রুদের জাহাজ আক্রমণ করবার আগেই আমরা ওই দ্বীপে গিয়ে নামতে পারব। তারপর পায়ের তলায় থাকে যদি মাটি,

আর একটা যুতসই স্থান যদি নির্বাচন করতে পারি, তাহলে এক হাজার শত্রুকেও আমি ভয় করি না। আপনার কি মত?

জয়ন্ত বললে, বিমলবাবু, এ অভিযানের নায়ক হচ্ছেন আপনি। আমরা আপনার সহচর মাত্র। আপনার মতই আমাদের মত।

সুন্দরবাবু নীরস স্বরে বললেন, তাহলে সত্যি-সত্যিই আমাদের যুদ্ধ করতে হবে?

কুমার বললে, তা ছাড়া আর উপায় কি? বিনা যুদ্ধে ওরা আমাদের মুক্তি দেবে বলে বোধহয় না। তবে আশার কথা এই যে, আমরা ওদের আগেই ডাঙায় গিয়ে নামতে পারব।

সুন্দরবাবু বিষণ্ণভাবে বললেন, এরমধ্যে আশা করবার মতো কিছুই আমি দেখতে পাচ্ছি না। ওই চিনে বোম্বেটে-বেটারাও তো দলে-দলে ডাঙায় গিয়ে নামবে?

ভুলে যাবেন না, আমরা থাকব ডাঙায়, গাছপালা বা ঢিপিঢ়পা বা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে। আমাদের এই অটোমেটিক বন্দুকগুলোর সুমুখ দিয়েই নৌকোয় করে ওদের ডাঙার ওপরে উঠতে হবে। আমাদের এক-একটা অটোমেটিক বন্দুক প্রতি মিনিটে কতগুলি বৃষ্টি করতে পারে জানেন তো? সাতশো! আধুনিক বিজ্ঞানের অদ্ভুত মারণাস্ত্র!

সুন্দরবাবু ভয়ে-ভয়ে বললেন, কিন্তু এভাবে মানুষ খুন করে শেষটা আইনের পাকে আমাদেরও বিপদে পড়তে হবে না তো?

কুমার হেসে বললে, সুন্দরবাবু, এ জায়গা হচ্ছে অরাজক। এই বোম্বেটেদের জল-রাজ্যে একমাত্র আইন হচ্ছে–হয় মারো, নয় মরো।

সুন্দরবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, হুম্!

বিমল তখন আবার চোখে দুরবিন লাগিয়ে শত্রু-জাহাজের গতিবিধি লক্ষ করছিল। কিন্তু সে জাহাজ তখন এত কাছে এসে পড়েছে যে আর দূরবিনের দরকার হয় না। খালি

চোখেই বেশ দেখা যাচ্ছে, তার ডেকের ওপরে দলে-দলে চিনেম্যান ব্যস্ত, উত্তেজিতভাবে এদিকে-ওদিকে আনাগোনা বা ছুটোছুটি করছে!

হঠাৎ বিমল দূরবিন নামিয়ে আবার ফিরে দাঁড়াল। তার মুখ বিবর্ণ, দৃষ্টি ভয়চকিত।

বিমলের মুখেচোখে ভয়ের চিহ্ন! এটা কি অসম্ভব! কুমার রীতিমতো অবাক হয়ে গেল।

জয়ন্ত বিস্মিত স্বরে বললে, কি হল বিমলবাবু, আপনার মুখচোখ অমনধারা কেন?

বিমল দূরবিনটা জয়ন্তের হাতে দিয়ে গম্ভীর স্বরে বললে, শত্রু-জাহাজের পিছনে চেয়ে দেখুন, বোম্বেটেদেরও চেয়ে ভয়াবহ এক শত্রু আমাদের গ্রাস করতে আসছে! আমি এখন ব্রিজের ওপরে কাপ্তেনের কাছে চললুম, আরও তাড়াতাড়ি ওই দ্বীপে গিয়ে উঠতে না পারলে আর রক্ষা নেই!

সুন্দরবাবু আঁতকে উঠে বললেন, বোম্বেটেরও চেয়ে ভয়াবহ শত্রু? ও বাবা, বলেন কি?

হ্যাঁ, হা, সুন্দরবাবু! এমন আর-এক শত্রু আমাদের আক্রমণ করতে আসছে, যার নামে ভয়ে কঁপে সারা দুনিয়া! তার সামনে আমাদের অটোমেটিক বন্দুকও কোনও কাজে লাগবে না!

এই বলেই বিমল জাহাজের বিজে-র দিকে ছুটল দ্রুতপদে।

.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । সুন্দরবাবুর সাগর-স্নান

চোখে দূরবিন লাগিয়ে জয়ন্ত যা দেখলে তা ভয়াবহই বটে!

বোম্বেটেদের জাহাজেরও অনেক পেছনে–বহু দুরে, আকাশ ও সমুদ্রের চেহারা একেবারে বদলে গেছে! নীচে বিপুল মাথা নাড়া দিয়ে উঠেছে প্রচণ্ড, উন্মত্ত, বৃহৎ তরঙ্গের-পর-তরঙ্গ

বলা চলে তাদের পর্বত-প্রমাণ! তারা লাফিয়ে ওপরে উঠছে, আঁপিয়ে নীচে পড়ছে, আবার উঠছে, আবার নামছে এবং ঘুরপাক খেতে-খেতে ফেনায়-ফেনায় সেখানকার নীলিমাকে যেন খণ্ড-খণ্ড করে দিয়ে এগিয়ে আসছে উল্কার মতন তীব্রগতিতে! ওপরে আকাশের রং হয়ে গেছে কালো মেঘে-মেঘে ঘোরা-রাত্রির মতোই অন্ধকার! বেশ বোঝা যায়, জেগে উঠেছে সেখানে সর্বধ্বংসী আকস্মিক ঝঞ্ঝাবায়ু–যার মস্তকান্দোলনে দিকে দিকে ঠিকরে পড়ছে বাঁধন-হারা নিকষ কালো মেঘের জটা এবং ঘনঘন পদাঘাতে লণ্ডভণ্ড হয়ে উথলে উঠছে তরঙ্গাকুল মহাসমুদ্র!

ফিরে দাঁড়িয়ে অভিভূত স্বরে জয়ন্ত বললে, টাইফুন?

কুমার খালি চোখেই সেদিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিয়ে বললে, হ্যাঁ, আমরা যাকে বলি ঘূর্ণাবর্ত।

মানিক বললে, কিন্তু আমাদের এখানে তো একটুও বাতাস নেই, অসহ্য উত্তাপে গা যেন পুড়ে যাচ্ছে।

কুমার বললে, ওসব টাইফুনের পূর্ব-লক্ষণ। এ-অঞ্চলে টাইফুন জাগবার সম্ভাবনা ওই লক্ষণ থেকেই জানা যায়।

জয়ন্ত বললে, কুমারবাবু, সমুদ্রযাত্রা আমার এই প্রথম, এর আগে টাইফুন কখনও দেখিনি। কিন্তু শুনেছি চিনা-সমুদ্রে টাইফুনের পাল্লায় পড়ে ফি-বৎসরেই অনেক জাহাজ অতলে তলিয়ে যায়।

সেইজন্যেই তো ওকে আমরা বোম্বেটেদেরও চেয়ে ভয়ানক বলে মনে করছি। বোম্বেটেদের সঙ্গে লড়া যায়, কিন্তু টাইফুনের সঙ্গে যুদ্ধ করা অসম্ভব। এখন আমাদের একমাত্র আশা ওই দ্বীপ। যদি টাইফুনের আগে ওখানে গিয়ে পৌঁছতে পারি! হয়তো পারবও, কারণ, আমরা দ্বীপের খুব কাছে এসে পড়েছি। এই দেখুন, আমাদের জাহাজের গতি আরও বেড়ে উঠেছে!

এতক্ষণ সুন্দরবাবু ছিলেন ভয়ে হতভম্বের মতো। এইবারে মুখ খুলে তিনি বলে উঠলেন, হুম! দুর্গে দুর্গতিনাশিনী!

জয়ন্ত বললে, কিন্তু বোম্বেটেদের জাহাজ এখনও দূরে রয়েছে, সে কি টাইফুনকে ফাঁকি দিতে পারবে?

কুমার বললে, ওদের নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

মানিক বললে, কি আশ্চর্য দৃশ্য! সমুদ্রের আর সব দিক শান্ত, কেবল একদিকেই জেগেছে। নটরাজের প্রলয়-নাচন!

কুমার বললে, সাধারণ সাইক্লোনে-র মতো টাইফুন বহু দূর ব্যেপে ছোটে না, ওইটেই তার বিশেষত্ব। কিন্তু ছোট হলেও তার জোর ঢের বেশি–যেটুকু জায়গা জুড়ে আসে, তার ভেতরে পড়লে আর রক্ষে নেই!

দূর থেকে মেগাফোনে বিমলের উচ্চ কণ্ঠস্বর জাগল–কুমার, সবাইকে নিয়ে তুমি ডাঙায় নামবার জন্যে প্রস্তুত হও। কেবল নিতান্ত দরকারি জিনিসগুলো গুছিয়ে নাও।

সবাই কেবিনের দিকে ছুটল। তারপর তাড়াতাড়ি কতকগুলো ব্যাগ ভরতি করে আবার তারা যখন ডেকের ওপরে এসে দাঁড়াল, দ্বীপ তখন একেবারে তাদের সামনে!

মানিক বিস্মিত কণ্ঠে বললে, সমুদ্র যে এখানে প্রকাণ্ড এক নদীর মতো হয়ে দ্বীপের ভেতরে ঢুকে গিয়েছে! এ যে এক স্বাভাবিক বন্দর!

জয়ন্ত বললে, হ্যাঁ, আমাদের জাহাজও এই বন্দরে ঢুকছে।

সুন্দরবাবু উৎফুল্ল স্বরে বললেন, জয় মা কালী! আমরা বন্দরে আশ্রয় পেয়েছি!

মানিক বলল, হ্যাঁ, আরও ভালো করে মা কালীকে ডাকুন সুন্দরবাবু! কারণ তিনি হচ্ছেন যুদ্ধের দেবী, আর বোম্বেটেরাও এই বন্দরে আসছে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেই।

সুন্দরবাবু দুই হাত জোড় করে মা কালীর উদ্দেশ্যে চক্ষু মুদে তিনবার প্রণাম করে বললেন, মানিক, এসময়ে আর ভয় দেখিও না, মা-জগদম্বাকে একবার প্রাণ ভরে ডাকতে দাও।

কুমার ফিরে দেখলে শত্রুরা দ্বীপ লক্ষ করে প্রাণপণে জাহাজ চালিয়েছে এবং দুরে তার দিকে বেগে তাড়া করে আসছে সাগর-তরঙ্গ তোলপাড় করে মূর্তিমান মহাকালের মতো সুভীষণ ঘূর্ণাবর্ত!

দ্বীপের ভেতরে ঢুকে সমুদ্রের জল আবার মোড় ফিরে গেছে, কাজেই জাহাজও সঙ্গে সঙ্গে মোড় ফিরলে। তখন দ্বীপের বনজঙ্গল ঠিক যবনিকার মতোই বাহির-সমুদ্র, ঘূর্ণাবর্ত ও বোম্বেটে-জাহাজের সমস্ত দৃশ্য একেবারে ঢেকে দিলে।

এমনসময়ে বিমল দৌড়ে সকলের কাছে এসে বললে, জয়ন্তবাবু, কাপ্তেন বললেন এখানকার জল গভীর নয়, জাহাজ আর চলবে না। নাবিকেরা নৌকোগুলো নামাচ্ছে, আমাদেরও জাহাজ থেকে নামতে হবে।

সুন্দরবাবু বললেন, কেন?

বোম্বেটেরাও এখানে আসছে, তারা আমাদের চেয়ে দলে ঢের ভারী। আমরা ডাঙায় না নামলে তাদের আক্রমণ ঠেকাতে পারব না।

সুন্দরবাবু আবার মুষড়ে পড়ে বললেন, তাহলে যুদ্ধ আমাদের করতেই হবে?

নিশ্চয়! টাইফুন আর বোম্বেটে–আমাদের এখন যুদ্ধ করতে হবে দুই শত্রুর সঙ্গে! ওই দেখুন, সেলর-রা এরই মধ্যে লাইফবোট ভাসিয়ে ফেলেছে! ওই শুনুন, মেগাফোনে কাপ্তেন-সায়েবের গলা! তিনি আমাদের নৌকোয় তাড়াতাড়ি নামতে বলছেন–নইলে

ঝোড়ো ঢেউ এখানেও এসে পড়তে পারে! চলুন, আর দেরি নয়। রামহরি, তুমি বাঘাকে সামলাও!

লাইফবোট যেখানে থামল, সেখানে জলের ধার থেকেই একটি ছোট্ট পাহাড় প্রায় একশো ফুট উঁচু হয়ে উঠেছে।

বিমল বললে, এইখানেই বন্দুক নিয়ে আমরা সবাই পাথরের আড়ালে অপেক্ষা করব। বোম্বেটেরা আমাদের বন্দুক এড়িয়ে নিতান্তই যদি ডাঙায় এসে নামে, তাহলে অবস্থা বুঝে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। আপাতত এই পাহাড়টাই হবে আমাদের দুর্গ। কি বলো কুমার, কি বলেন জয়ন্তবাবু?

জয়ন্ত বললে, সাধুপ্রস্তাব। কিন্তু বিমলবাবু, একটা গোলমাল শুনতে পাচ্ছেন?

হুঁ, ঝোড়ো বাতাসের গোঁ-গোঁ হু-হু, সমুদ্রের হুঙ্কার!

কুমার বললে, কেবল তাই নয়দূর থেকে যেন অনেক মানুষের কোলাহলও ভেসে আসছে!

রামহরি বললে, এতক্ষণ চারিদিক গুমোট করে ছিল, এখন জোর হাওয়ায় এখানকার গাছপালাগুলো নুয়ে-নুয়ে পড়ছে! ঝড় বোধহয় এল!

মানিক বললে, ঝড় এল, কিন্তু বোম্বেটে-জাহাজ কোথায়?

সুন্দরবাবু বললেন, হুম!

বাঘা বললে, ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ!

বিমল বললে, তবে কি বোম্বেটেগুলো ঝড়ের খপ্পরেই পড়ল? দাঁড়াও, দেখে আসি—বলেই সে তাড়াতাড়ি পাহাড়ের ওপরে উঠতে লাগল।

রামহরি উদ্বিগ্ন স্বরে বললে, ওপরে উঠো না খোকাবাবু, ওপরে উঠো না! বেশি ঝড় এলে উড়ে যাবে!

কিন্তু বিমল মানা মানলে না। পাহাড়ের প্রায় মাঝবরাবর উঠেই দাঁড়িয়ে পড়ে একদিকে তাকিয়ে সে চমৎকৃত স্বরে বললে, আশ্চর্য, আশ্চর্য! কুমার, কুমার, শিগগির দেখে যাও।

বিপুল কৌতূহলে সবাই দ্রুতপদে ওপরে উঠতে লাগল–একমাত্র সুন্দরবাবু ছাড়া। তার বিপুল উঁড়ি উর্ধমার্গের উপযোগী নয়।

বাস্তবিকই সে এক আশ্চর্য দৃশ্য! যে বিষম টাইফুনের ভয়ে তারা সবাই এখানে এসে। আশ্রয় নিয়েছে, সে-ভয়ঙ্কর দ্বীপের দিকে না এসে যেন পাশ কাটিয়েই প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে চলেছে অন্য দিকে হু-হু করে! দ্বীপের দিকে এসেছে খানিকটা উদ্দাম হাওয়ার ঝটকা মাত্র, কিন্তু টাইফুন নিজে যেখান দিয়ে যাচ্ছে সেখানকার শূন্যে দুলছে নিরন্ধ্র অন্ধকার নীচে কেবল। অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে রুদ্র সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গদলের হিন্দোলা! আর ভেসে-ভেসে আসছে প্রমত্ত ঘূর্ণাবর্তের বিকট চিৎকার, গম্ভীর জল কল্লোল, বহু মানবকণ্ঠের আর্তনাদ!

কুমার অভিভূত স্বরে বললে, এমন বিচিত্র ঝড় আর কখনও দেখিনি! কিন্তু বোম্বেটেদের জাহাজাখানা কোথায় গেল?

বিমল বললে, ওখানকার অন্ধকার ভেদ করে কিছুই দেখবার উপায় নেই! তবে মানুষের গোলমাল শুনে বোধ হচ্ছে, ঝড়ের সঙ্গে-সঙ্গে সে-ও কোথায় ছুটে চলেছে, হয়তো সমুদ্র এখনি তাকে গিলে ফেলবে!

রামহরি সানন্দে বললে, জয় বাবা পবনদেব! আজ তুমিই আমাদের সহায়!

খানিকক্ষণ পরেই চারিদিক আবার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শূন্যে নেই অন্ধ মেঘের কালিমা, সমুদ্রে নেই বিভীষণের তাণ্ডবলীলা। একটু আগে কিছুই যেন হয়নি, এমনিভাবেই মুখর

নীলসাগর আবার বোবা নীলাকাশের কাছে আদিম যুগের জীবহীনা ধরিত্রীর পুরাতন গল্প-বলা শুরু করলে।

সূর্য সাগর-স্নানে নেমে অদৃশ্য হল, কিন্তু আকাশ আর পৃথিবীতে এখনও আলো যেন ধরছে না! দূর থেকে আঁকে-ঝকে সামুদ্রিক পাখি ফিরে আসছে দ্বীপের দিকে।

পাহাড়ের ওপরে বসে সবাই বিশ্রাম করছিল। সেখান থেকে দ্বীপটিকে দেখাচ্ছে চমৎকার পরিস্থানের মতো। নানা জাতের গাছেরা সেখানে সংগীতময় সবুজ উৎসবে মেতে আছে এবং তাদের মধ্যে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে পাম-জাতীয় গাছেরাই।

কোথাও পাহাড়ের আনন্দাশ্রুধারার মতো ঝরে পড়ছে ঠিক যেন একটি খেলাঘরের ঝরনা। রূপালি ফিতার মতো তার শীর্ণ ধারা সকৌতুকে পাথরে-পাথরে নাচতে নাচতে নেমে এসেছে নীচেকার সুন্দরশ্যাম জমির ওপরে-যেখানে শ্যামলতাকে সচিত্র করে তুলেছে রং-বেরঙের পুঞ্জ পুঞ্জ ফুলের দল। খানিক পরেই রাত হবে, তারার সভায় উঁদ হাসবে, আর নতুন জ্যোৎস্নার ঝলমলে আলো মেঘে স্বপ্নবালারা আসবে যেন সেই ফুলের ঘাস-গালিচার ওপরে বসে ঝরনার কলগান শুনতে!

বিমল এইসব দেখতে-দেখতে একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, শহর আর সভ্যতা ছেড়ে পৃথিবীর যেখানেই যাই সেখানেই দেখি, রেখায়-রেখায় লেখা আছে সৌন্দর্যের কবিতা। শহরে বসে হাজার টাকা খরচ করে যতই ড্রয়িং রুম সাজাও, কখনওই জাগবে না সেখানে রূপের এমন ঐশ্বর্য, লাবণ্যের এত ছন্দ! শহরে বসে আমরা যা করি তা হচ্ছে আসল সৌন্দর্যের ক্যারিকেচার মাত্র, কাগজের ফুলের মতোই অসার! তাই তো আমি যখন-তখন কুৎসিত শহর আর কপট সভ্যতাকে পেছনে ফেলে ছুটে যেতে চাই সৌন্দর্যময় অজানা বিজনতার ভেতরে। রামহরি জানে, আমরা দুরন্ত ডানপিটে, খুঁজি খালি অ্যাডভেঞ্চার। কিন্তু তুমি জানো কুমার, এ কথা সত্য নয়! চোখের সামনে রয়েছে এই যে অপরূপের নাট্যশালা, আমাদের কল্পনা কি এখানে অভিনয় করতে ভালোবাসে না? আমরা কি কেবল ঘুষোঘুষি করতে আর বন্দুক ছুঁড়তেই জানি, কবিতা পড়তে পারি না?

কুমার বললে, আমার কি মনে হচ্ছে জানো বিমল? ওই ফুলের বনে, ওই ঝরনার ধারে একখানি পাতার কুঁড়েঘর গড়ে সত্যিকার কবিতার জীবনযাপন করি! চারিদিকে বনের গান, পাখির তান, বাতাসের ঝঙ্কার, মৌমাছির গুঞ্জন, ফুলের সঙ্গে প্রজাপতির রঙের খেলা, দিনে মাঠে-মাঠে রোদের কাঁচা সোনা, রাতে গাছে-গাছে চাঁদনির ঝিলিমিলি, আর এরই মধ্য থেকে সর্বক্ষণ শোনা যায় অনন্ত সমুদ্রের মুখে মহাকাব্যের আবৃত্তি! কলকাতার পায়রার খোপে। আর আমার ফিরতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

জয়ন্ত বললে, পৃথিবীকে আমার যখন বড় ভালো লাগে তখন আমি চাই বাঁশি বাজাতে! কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এখন আমার সঙ্গে আছে বাঁশির বদলে বন্দুক। বন্দুকের নল থেকে তো। গান বেরোয় না, বেরোয় কেবল বিষম ধমক।

মানিক বললে, কেন জয়ন্ত, খুশি হলেই তো তুমি আর একটি জিনিস ব্যবহার করো! নস্যির ডিবেটাও কি তুমি সঙ্গে আননি?

জয়ন্ত বললে, হ্যাঁ, মানিক, নস্যির ডিবেটা আমার পকেটেই আছে। কিন্তু কবিতা কোনওদিন ডিবের ভেতরে নস্যির সঙ্গে বাস করে না। আজ আমাদের সামনে দেখছি যে। মূর্তিমান সংগীতকে, তার নাচের ছন্দ জাগতে পারে কেবল আমার বাঁশির মধ্যেই।

সুন্দরবাবু ধীরে-ধীরে অনেক কষ্টে দোদুল্যমান ভূঁড়ির বিদ্রোহিতাকে আমলে না এনেই পাহাড়ের ওপরে উঠে এসেছিলেন। কিন্তু বন্ধুদের কবিত্ব-চর্চা, আর তিনি বরদাস্ত করতে পারলেন না, বিরক্ত স্বরে বললেন, হুম! পাহাড় থেকে ঝরনা ঝরছে, বাতাসের ধাক্কা খেয়ে গাছগুলো নড়ে-চড়ে শব্দ করছে, কতগুলো পাখি চাঁ-া করে চাঁচাচ্ছে, আর মাঠে ঘাস গজাচ্ছে, এসব নিয়ে এত বড়-বড় কথার কিছু মানে হয় না। চল হে রামহরি, আমরা সরে পড়ি।

জয়ন্ত হাসতে-হাসতে বললে, কিন্তু যাবেন কোথায়? জাহাজে?

না। গরমে ছুটোছুটি করে শরীরটা কেমন এলিয়ে পড়েছে। এখানকার পাহাড়ের তলায় সমুদ্রের ঠান্ডা জলে বেশি ঢেউ নেই দেখছি। একটু সমুদ্র-স্নান করবার ইচ্ছে হয়েছে। রামহরি, কি বলো?

রামহরি বললে, বেশ তো, চলুন না! আমিও একবার চান করে নিই-গে। আয় রে বাঘা!

কিন্তু তোমার বাঘাকে আগে-আগে যেতে বলো রামহরি, নইলে ও আবার হয়তো আমার পা শুঁকতে আসবে!

রামহরি বললে, বাঘা, সাবধান! আবার যেন আমাদের সুন্দরবাবুর সঙ্গে গায়ে পড়ে ভাব করতে যেও না! যাও, এগিয়ে যাও।

বাঘার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল না যে, সুন্দরবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবার জন্যে তার মনে আর কিছুমাত্র বাসনা আছে। কিন্তু সে রামহরির কথা বুঝে ল্যাজ উঁচু করে আগের দিকে দিলে লম্বা এক দৌড়।

রামহরির সঙ্গে সুন্দরবাবু যখন পাহাড় থেকে নেমে জলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন, তখন আকাশের আলো তার উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলছে ধীরে-ধীরে।

রামহরি বললে, শিগগির দুটো ডুব দিয়ে নিন, আলো থাকতে থাকতেই আমাদের আবার জাহাজে গিয়ে উঠতে হবে।

কিছু ভয় নেই রামহরি, আজ পূর্ণিমা। আজ অন্ধকার জব্দ!

ওই শুনুন, কু দিয়ে জাহাজ আমাদের ডাকছে। ওই দেখুন, পাহাড়ের ওপর থেকে ওঁরা সবাই নেমে আসছেন!

সুন্দরবাবু জলের ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি সুদীর্ঘ আঃ উচ্চারণ করলেন। তারপর বললেন, বাঃ, তোমাদের বাঘা দেখছি যে দিব্যি সাঁতার কাটছে! আমিও একটু সাঁতার দিয়ে নি। কি চমৎকার ঠান্ডা জল! দেহ যেন জুড়িয়ে গেল!

জল কেবল ঠান্ডা নয়, নীলিমা-মাখানো সুন্দর, স্বচ্ছ। তলাকার প্রত্যেক বালুকণাটি পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে–এখানকার জলের মধ্যে কোনওই অজানা রহস্য নেই। কাজেই সুন্দরবাবু মনের সুখে নির্ভয়ে সাঁতার কাটতে লাগলেন।

দূর থেকে মানিক চিৎকার করে বললে, উঠে আসুন সুন্দরবাবু, অত আর সাঁতার কাটতে হবে না। এখানকার সমুদ্রে হাঙর আছে!

সুন্দরবাবু আঁতকে উঠে বললেন, হুম, কি বললে? হাঙর? তাই তো হে, একথা তো এতক্ষণ মনে হয়নি! বাব্বাঃ! দরকার নেই আমার সাঁতার কেটে! তিনি তীরের দিকে ফিরলেন এবং সঙ্গে-সঙ্গেই অনুভব করলেন জলের ভিতর থেকে প্রাণপণে কে তার কোমর জড়িয়ে ধরলে!

ওরে বাবা রে, হুম-হুম! হাঙর, হাঙর! জয়ন্ত, মানিক, রামহরি! আমাকে হাঙরে ধরেছে হু-হু-হুঁ-হুঁ-হুম!

রামহরি একটু তফাতে ছিল। কিন্তু সেইখান থেকেই সে স্তম্ভিত চোখে বেশ দেখতে পেল যে, সুন্দরবাবুর দেহের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে রয়েছে, সুদীর্ঘ একটা ছায়ামূর্তি!

সুন্দরবাবু পরিত্রাহি চিৎকার করে বললেন, বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও! হাঙর নয়, এ যে একটা মানুষ! এ যে মড়া! ওরে বাবা, এ যে ভূত! এ যে আমাকে জলের ভেতরে টানছে–ও জয়ন্ত, ও মানিক!

বিমল, কুমার, জয়ন্ত ও মানিক তিরের মতো পাহাড় থেকে নেমে এল। ভূতের নামে রামহরি একবার শিউরে উঠল বটে, কিন্তু তখনি সে দুর্বলতা সামলে নিয়ে বেগে সাঁতার

কেটে সুন্দরবাবুর দিকে অগ্রসর হল। কিন্তু সর্বাগ্রে সুন্দরবাবুর কাছে গিয়ে পড়ল বাঘা–তার দুই চক্ষু জ্বলছে তখন তীব্র উত্তেজনায়!

আর পারছি না, একটা জ্যান্ত মড়া আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বাঁচাও!

.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । জীবন্ত মৃতদেহ

ডুবে মলুম, ডুবে মলুম, বাঁচাও!–সুন্দরবাবু আবার একবার চেঁচিয়ে উঠলেন।

তিনি বেশ অনুভব করলেন, দু-খানা অস্থিচর্মসার, কিন্তু লোহার মতন কঠিন এবং বরফের মতন ঠান্ডা-কনকনে বাহু তাকে জড়িয়ে ধরে পাতালের দিকে টানছে, ক্রমাগত টানছে!

দারুণ ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে তিনি তার দিকে ভালো করে তাকাতে পারলেন না বটে, কিন্তু আবছা-আবছা যেটুকু দেখতে পেলেন তাই-ই হল তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। সে হচ্ছে একটা মৃত-মানুষের জীবন্ত মৃত মানুষের মূর্তি, আর তার চোখদুটো হচ্ছে মরা মাছের মতো!

রামহরি দু-হাতে জল কেটে এগুতে-এগুতে সভয়ে দেখল, হুম বলে বিকট এক চিৎকারের সঙ্গে-সঙ্গে সুন্দরবাবু হুশ করে ডুবে গেলেন এবং সেই মুহূর্তে বাঘাও দিলে জলের তলায় ডুব।

ওদিকে বিমল, কুমার, জয়ন্ত ও মানিকও ততক্ষণে জলে ঝাঁপ দিয়ে এগিয়ে আসছে।

কিন্তু তাদের আর বেশিদূর এগিয়ে আসতে হল না হঠাৎ দেখা গেল, সুন্দরবাবু আবার ভেসে উঠে প্রাণপণে সাঁতার কেটে তীরের দিকে ফিরে আসছেন! বাঘাও আবার ভেসে উঠেছে।

রামহরি খুব কাছে ছিল। সে দেখতে পেলে, জলের ওপরে খানিকটা রক্তের দাগ এবং বাঘার মুখও রক্তাক্ত।

ব্যাপারটা বুঝে তারিফ করে সে বললে, বাহাদুর বাঘা, বাহাদুর!

কিন্তু সেই আশ্চর্য ও অসম্ভব মূর্তিটার আর কোনও পাত্তাই পাওয়া গেল না।

সকলে ডাঙার ওপরে উঠল। সুন্দরবাবু আর রামহরি ও বাঘা ছাড়া সে বিকট মূর্তিটাকে আর কেউ দেখেনি, সুতরাং আসল ব্যাপারটাও এখনও কেউ বুঝতে পারলে না।

বালির ওপরে হাত-পা ছড়িয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে সুন্দরবাবু হাঁপাতে লাগলেন হাপরের মতো।

বিমল জিজ্ঞাসা করলে, সুন্দরবাবু, আপনাকে কি হাঙরে ধরেছিল?

কুমার বললে, না বিমল, তা হতে পারে না। হাঙরে ধরলে উনি অমন অক্ষত দেহে ফিরে আসতেন না।

বিমল বললে, হুঁ, সেকথা ঠিক। কিন্তু তবে কে ওঁকে জলের ভেতরে আক্রমণ করতে পারে?

সুন্দরবাবু বেদম হয়ে খালি হাঁপান! এখন তার একটা হুম পর্যন্ত বলবার শক্তি নেই। বাঘা গম্ভীর মুখে এসে সুন্দরবাবুর সর্বাঙ্গ শুঁকে বোধহয় পরীক্ষা করে দেখলে যে, তাঁর দেহ অটুট আছে কি না! পরীক্ষার ফল নিশ্চয়ই সন্তোষজনক হল, কারণ ঘনঘন ল্যাজ নেড়ে সে মনের আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল।

জয়ন্ত বললে, এখানে জলের ভেতরে অক্টোপাস থাকে না তো?

রামহরি বললে, কি বললেন?

অক্টোপাস।

তাকে কি মানুষের মতন দেখতে?

মোটেই নয়। তোমাকে কতকটা বোঝাবার জন্যে বরং বলা যায়, তাকে দেখতে অনেকটা বিরাট ও অদ্ভুত মাকড়শার মতো। সমুদ্রের জলে তারা লুকিয়ে থাকে আর আটখানা পা দিয়ে জড়িয়ে শিকার ধরে মাংস-রক্ত শুষে খায়।

না বাবু, না। আপনি যে কিম্ভুতকিমাকার জানোয়ারের কথা বললেন নিশ্চয়ই সেটা ভয়ানক, কিন্তু সুন্দরবাবুকে যে জড়িয়ে ধরেছিল তাকে দেখতে মানুষের মতো।

বিমল হো-হো করে হেসে উঠে বললে, কি যে বলো রামহরি! মানুষ কি জলচর জীব? জলের ভেতর থেকে আক্রমণ করে সে কি এতক্ষণ ধরে জলের তলাতেই ডুব মেরে থাকতে পারে?

মানিক মুখ ফিরিয়ে দেখলে, সেই বিশাল হ্রদের মতো জলরাশি একেবারে স্থির হয়ে রয়েছে। তাদের জাহাজ আর লাইফবোট ছাড়া তার ওপরে আর কোনও জীবজন্তুর চিহ্নমাত্র নেই। বিমল ঠিক কথাই বলেছে। সুন্দরবাবুকে যে আক্রমণ করেছিল নিশ্চয়ই সে মানুষ নয়।

রামহরি দৃঢ়স্বরে বললে, না খোকাবাবু, আমি মিছে কথা বলিনি। সে মানুষ কি না জানি না, কিন্তু তার চেহারা মানুষের মতোই। সুন্দরবাবুর কোমর সে নীচে থেকে দু-হাতে আঁকড়ে ধরেছিল। কাচের মতো পরিষ্কার জলে তার হাত, পা, মুখ, দেহ বেশ দেখা যাচ্ছিল।

এতক্ষণ পরে সুন্দরবাবুর হাঁপ-ছাড়া হল সমাপ্ত। দু-হাতে ভর দিয়ে উঠে বসে তিনি বললেন, হুম। রামহরি কিচ্ছু ভুল বলছে না। আমাকে ধরেছিল একটা জ্যান্ত মরা-মানুষ!

জ্যান্ত মরা- মানুষ!

হ্যাঁ, আমি তাকে স্বচক্ষে দেখেছি–একেবারে আসল মড়া! আমি তার হাতের ছোঁয়া পেয়েছি–একেবারে কনকনে অস্বাভাবিক ঠান্ডা! কিন্তু সে জ্যান্ত, তার হাতের চাপে আমার

দম বন্ধ হয়ে আসছিল! মরা মাছের মতো স্থির দুই চোখে আমার দিকে সে তাকিয়ে ছিল–বাপ রে, ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়!

রামহরি বললে, জ্যান্ত মড়া মানেই হচ্ছে, পিশাচ। সুন্দরবাবু নিশ্চয়ই কোনও পিশাচের পাল্লায় পড়েছিলেন। ভাগ্যে আমাদের বাঘা ছিল, তাই এ-যাত্রা কোনও-গতিকে বেঁচে গেলেন! বাঘার কাছে পিশাচও জব্দ!

সুন্দরবাবু কৃতজ্ঞ-দৃষ্টিতে বাঘার দিকে তাকিয়ে বললেন, হুম্। বাঘা, আয় রে, আমার কাছে আয়! তুই যে কি রত্ন, এতদিন আমি চিনতে পারিনি। এবার থেকে আর তোকে আমি কিছু বলব না, তোকে ভালো-ভালো খাবার খেতে দেব। খাসা কুকুর, লক্ষ্মী কুকুর!

মানিক বললে, সুন্দরবাবু, আপনি নিশ্চয় মৎস্যনারী আর নাগকন্যার গল্প শুনেছেন?

সুন্দরবাবু বেশ বুঝলেন মানিকের মাথায় কোনও নতুন দুষ্টুমি বুদ্ধির উদয় হয়েছে, তার পেছনে লাগা হচ্ছে তার চিরকেলে স্বভাব। বললেন, হুঁ, শুনেছি। কি হয়েছে তা?

আমার বোধহয় কোন মৎস্য-নারী কি নাগ-কন্যা আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছিল।

একটু গরম হয়ে সুন্দরবাবু বললেন, আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে সে কি করত?

বিয়ে করত। আপনাকে দেখে তার পছন্দ হয়েছিল কিনা।

একেবারে মারমুখো হয়ে সুন্দরবাবু বললেন, চোপরাও মানিক, চোপরাও! তোমার মতন তাঁদোড় আমি জীবনে আর দেখিনি, আমার হাতে একদিন তুমি মার খাবে জেনো।

বিমল গম্ভীরমুখে ভাবতে-ভাবতে বললে, জয়ন্তবাবু, আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারছেন?

কিছু না। কেবল এইটুকু বুঝতে পারছি, সুন্দরবাবুর চোখের ভ্রম হয়েছে।

সুন্দরবাবুর আর রামহরির–দুজনেরই একসঙ্গে চোখের ভ্রম হল?

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন মামলার ফলেই আজ আমরা এখানে এসেছি। সেই মামলাটার কথা ভেবে দেখুন। লোকের-পর-লোক দেখতে লাগল, শূন্য-পথে ছায়ামূর্তির মতন কে উড়ে যায়। কিন্তু তারা সকলেই কি ভুল দেখেনি? হুঃ, জ্যান্ত মড়া! পিশাচ! সে আবার বাস করে জলের তলায়! বলেন কি মশাই, এসব কি বিশ্বাস করবার কথা?

বিশ্বাস আপনাকে কিছুই করতে বলছি না জয়ন্তবাবু! কিন্তু আমার মন হচ্ছে, এ ব্যাপারটার মধ্যে কোনও অলৌকিক বা অসাধারণ রহস্য থাকলেও থাকতে পারে। জীবনে অনেকবারই আমাকে আর কুমারকে এমন সব ঘটনার মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়েছে, যা অলৌকিক ছাড়া আর কিছুই নয়। বলতে কি, অলৌকিক ব্যাপার দেখে-দেখে এখন আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। আর এটাও ভুলবেন না যে, আজ আমরা সকলেই চলেছি কোনও এক অজানা দেশে, কেবল অলৌকিক দৃশ্য দেখবারই আশায়। এখন আমরা সেই অমৃত-দ্বীপের খুব কাছে এসে পড়েছি। আজ হয়তো এইখান থেকেই অলৌকিক রহস্যের আরম্ভ হল! ওই শুনুন, জাহাজ থেকে আবার আমাদের ডাকছে, সন্ধ্যাও হয়েছে, আর এখানে নয়।

পাম জাতীয় একদল গাছের ফাঁক দিয়ে পূর্ণিমা-চাঁদের মুখ উঁকি মারছিল সকৌতুকে। জলে-স্থলে-শুন্যে সর্বত্রই জ্যোৎসার রূপলেখা পড়েছে ছড়িয়ে এবং দিনের সঙ্গে রাতের ভাব হয়েছে দেখে অন্ধকার আজ যেন ভয়ে নিজ-মূর্তি ধারণ করতে পারছে না।

সকলে একে-একে লাইফবোটে গিয়ে উঠল! হ্রদের স্বচ্ছ জল ভেদ করে চাঁদের আলো নেমে গিয়েছে নীচের দিকে। কিন্তু তাদের দৃষ্টি সেখানে যাকে খুঁজছিল তাকে দেখতে পেলে না। তবু একটা ভয়াবহ অসম্ভবের সম্ভাবনা হ্রদের নীলিমাকে করে রেখেছিল রহস্যময়।

.

চাঁদের বাতি নিবিয়ে দিয়ে এল অরুণ প্রভাত। মহাসাগরকে আলোময় করে সে পূর্বাকাশে এঁকে দিলে তরুণ সূর্যের রক্ততিলক। জাহাজ বেগে ছুটেছে অমৃত-দ্বীপের উদ্দেশে।

ডেকের ওপরে মর্নিং ওয়াক করতে করতে সুন্দরবাবু জাহাজের রেলিং ধরে একবার দাঁড়ালেন। এবং তৎক্ষণাৎ তার চোখদুটো উঠল বেজায় চমকে। উত্তেজিত স্বরে তিনি ডাকলেন, জয়ন্ত! মানিক! বিমলবাবু! কুমারবাবু!

সবাই এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সুন্দরবাবুর জোর-তলবে তাড়াতাড়ি সেখানে ছুটে এল।

সুন্দরবাবু বিবর্ণমুখে সমুদ্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

জাহাজের পাশেই নীলজলে ভাসছে মানুষের একটা রক্তহীন সাদা মৃতদেহ। তার ভাবহীন, নিষ্পলক, বিস্ফারিত দুটো চোখ শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে আছে জাহাজের দিকে। তার আড়ষ্ট দেহে বিন্দুমাত্র জীবনের চিহ্ন নেই বটে, কিন্তু কী আশ্চর্য, স্রোতের বিরুদ্ধে বেগবান জাহাজের সঙ্গে সঙ্গেই সেটা ভেসে চলেছে সোঁ-সোঁ করে!

হতভম্ব মুখে জয়ন্ত বললে, আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

বিমল কিছু বললে না, রেলিংয়ের ওপরে ঝুঁকে পড়ে আরও ভালো করে মুর্তিটাকে দেখতে লাগল।

সুন্দরবাবু তিক্তস্বরে বললেন, মানিক, ওই কি তোমার মৎস্যনারী? দেখছ, ওটা একটা বুড়ো চিনেম্যানের মড়া? ওই-ই কাল আমাকে আক্রমণ করেছিল!

মানিক বললে, নিশ্চয় ও বোম্বেটে-জাহাজের যাত্রী ছিল, কালকের টাইফুনে জলে ডুবে মারা পড়েছে।

হুম, মারা পড়েছেই বটে! তাই স্রোতের উলটোমুখে এগিয়ে চলেছে কলের জাহাজের সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে!

রামহরি কাঁপতে কাঁপতে বললে, সকলে রাম-নাম করো–রাম-নাম করো–রাম-নাম করো। ও পিশাচ, আমাদের রক্ত খেতে চায়!

কুমার বললে, বিমল, তাও সাধুদের কথা স্মরণ কর। যারা সিয়েন বা অমর হয়, জলে-স্থলে-শুন্যে তাদের গতি হয় অবাধ! আমরা হয়তো অমৃত-দ্বীপের কোনও সিয়েন কেই আজ চোখের সামনে স্পষ্ট দেখছি।

জয়ন্ত বললে, আজকের যুগে ও-সব আজগুবি কথা মানি কি করে?

বিমল বললে, না মেনেও তো উপায় নেই জয়ন্তবাবু! ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন মামলার সময়েই আমি কি আপনাকে মনে করিয়ে দিইনি যে, কাশীর ত্রৈলঙ্গস্বামী কত শত বৎসর বেঁচেছিলেন তা কেউ বলতে পারে না? সময়ে সময়ে তাঁরও দেহ বৎসরের- পর- বৎসর ধরে গঙ্গাজলে ভেসে ভেসে বেড়াত? ত্রৈলঙ্গস্বামীর কথা তো পৌরাণিক কথা নয়, আধুনিক যুগেরই কথা!

বিমলবাবু, আপনার বিরুদ্ধে কিছু বলবার মতো যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না, আর চোখের সামনে যা স্পষ্ট দেখছি তাকে উড়িয়ে দেওয়ার শক্তিও আমার নেই। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আমরা সবাই একসঙ্গে পাগল হয়ে গেছি! এ-ও কি সম্ভব? বেগবান অথচ আড়ষ্ট নিশ্চেষ্ট মৃতদেহ ছোটে আধুনিক কলের জাহাজের সঙ্গে। এর পরেও আর অবিশ্বাস করব কিসে? এখন অচল পাহাড়কেও চলতে দেখলে আমি বিস্মিত হব না!

সুন্দরাবাবু বললেন, ও-সব তর্ক থো করুন মশাই, থো করুন। আমার কথা হচ্ছে, সিয়েন-রা কি মানুষের মাংস খায়? নইলে ও কাল আমাকে আক্রমণ করেছিল কেন?

বিমল বললে, বোধহয় ও আমাদের উদ্দেশ্য জানতে পেরেছে। ও তাই বাধা দিতে চায়, আমাদের আক্রমণ করতে চায়!

তাই নাকি? হুম্।–বলেই সুন্দরবাবু এক ছুটে নিজের কামরায় গিয়ে একটি বন্দুক নিয়ে ফিরে এলেন।

কুমার বললে, আপনি কি করতে চান সুন্দরবাবু?

সুন্দরবাবু বললেন, আমি দেখতে চাই, অমৃত-দ্বীপে যারা থাকে তারা কেমনধারা অমর? আমি দেখতে চাই, ওই জ্যান্ত মড়াটা বন্দুকের গরমাগরম বুলেট হজম করতে পারে কিনা?

রামহরি সভয়ে বললে, পিশাচকে ঘাঁটাবেন না বাবু, পিশাচকে ঘাঁটাবেন না। কিসে কি হয় বলা তো যায় না!

আরে, রেখে দাও তোমার পিশাচ-ফিশাচ! পুলিশের কাজই হচ্ছে যত নরপিশাচ বধ করা।–এই বলেই সুন্দরবাবু বন্দুক তুলে সেই ভাসন্ত দেহটার দিকে লক্ষ্য স্থির করলেন!

ফল কি হয় দেখবার জন্যে সকলে অপেক্ষা করতে লাগল, সাগ্রহে।

.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । দ্বীপে

সুন্দরবাবু তার অটোমেটিক বন্দুক ছুড়লেন–এক সেকেন্ডের মধ্যে সেই সাংঘাতিক আধুনিক মারণাস্ত্রের গর্ভ থেকে বেরিয়ে হুড়হুড় করে বয়ে গেল অনেকগুলো গুলির ঝড়।

কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সমুদ্রের বুকে ভাসন্ত সেই আশ্চর্য জীবিত বা মৃত দেহটা জলের তলায় অদৃশ্য হল!

সুন্দরবাবু বন্দুক নামিয়ে বললেন, হুম। আমার লক্ষ্য অব্যর্থ। বেটার গা নিশ্চয় ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

জয়ন্ত বললে, আমার বোধহয় গুলি লাগবার আগেই ও আপদটা সমুদ্রে ডুব মেরেছ!

বিমল বললে, আমারও সেই বিশ্বাস।

কুমার বললে, মড়াটা খালি জ্যান্ত নয়, বেজায় ধূর্ত!

মানিক বললে, ও হয়তো এখন ডুব সাঁতার দিচ্ছে!

রামহরি বললে, রাম, রাম, রাম, রাম! পিশাচকে ঘাঁটিয়ে ভালো কাজ হল না।

সুন্দরবাবু বললেন, অমরই বলো, জ্যান্ত মড়াই বলো আর পিশাচই বলো, অটোমেটিক বন্দুকের কাছে কোনও বাবাজির কোনওই ওস্তাদি খাটবে না। এতক্ষণে বেটার দেহ ভেঙে গুঁড়ো হয়ে অতলে তলিয়ে গেছে।

কিন্তু সুন্দরবাবুর মুখের কথা ফুরুতে-না-ফুরুতেই সেই রক্তশূন্য সাদা দেহটা হুশ করে আবার ভেসে উঠল! তার মুখে ভয়ের বা রাগের কোনও চিহ্নই নেই এবং তার ভাবহীন ও পলকহীন চোখদুটো আগেকার মতোই বিস্ফারিত হয়ে তাকিয়ে আছে জাহাজের দিকে!

রামহরি আর সে দৃশ্য সইতে পারলে না, ওঠে-কি-পড়ে এমনি বেগে ছুটে আড়ালে পালিয়ে গেল।

বিমল হাসতে হাসতে বললে, ও সুন্দরবাবু, এখন আপনার মত কি? দেখছেন, মড়াটা এখনও অটুট দেহে বেঁচে আছে?

প্রথমটা সুন্দরবাবু রীতিমতো হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরেই সেভাব সামলে নিয়ে বললেন, তবে আমার টিপ ঠিক হয়নি। রোসো, এইবারে দেখাচ্ছি মজাটা! আরে, আরে, বন্দুক তুলতে-না-তুলতেই বেটা যে আবার ডুব মারলে হে! এমন ধড়িবাজ মড়া

তো কখনও দেখিনি! হুম, কিন্তু যাবে কোথায়? এই আমি বন্দুক বাগিয়ে রইলুম, উঠেছে কি গুলি করেছি। আমার সঙ্গে কোনও চালাকিই খাটবে না বাবা!

কিন্তু দেহটা আর ভেসে উঠল না। সুন্দরবাবু তার প্রস্তুত বন্দুক নিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর বললেন, নাঃ! হতভাগা গুলি খেতে রাজি নয়, সরে পড়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে!

জয়ন্তের মুখ গম্ভীর। সে চিন্তিতভাবে বললে, আজ যা দেখলুম, লোকের কাছে বললে আমাদের পাগল বলে ঠাট্টা করবে। বিমলবাবু, জানি না অমৃত-দ্বীপ কেমন ঠাই! কিন্তু সেখানে যারা বাস করে, তাদের চেহারা কি ওই ভাসন্ত দেহটার মতো।

বিমল মাথা নেড়ে বললে, আমিও জানি না।

মানিক বললে, আমার কিন্তু কেমন ভয়-ভয় করছে!

কুমার বললে, ভয়! ভয়কে আমরা চিনি না। ভয় আমাদের কাছে আসতে ভয় পায়।

মানিক একটু হেসে বললে, ভয় নেই, কুমারবাবু, আমিও ভীরু নই। এমন আজগুবি ভুতুড়ে দৃশ্য দেখে আমার বুকটা ছাঁৎ-ছাঁৎ করছে বটে, কিন্তু সেটা হচ্ছে মানুষের সংস্কারের দোষ। আমাকে কাপুরুষ ভাববেন না, দরকার হলে আমি ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানবেরও সঙ্গে হাতাহাতি করতে রাজি আছি। আমি–

কুমার বাধা দিয়ে মানিকের একখানা হাত চেপে ধরে বললে, আমি মাপ চাইছি মানিকবাবু! আমি আপনাকে কাপুরুষ মনে করি না।

সুন্দরবাবু বললেন, তা কুমারবাবু, আপনি আমাকে ভীতুই ভাবুন, আর কাপুরুষই ভাবুন, আমি কিন্তু একটা স্পষ্ট কথা বলতে চাই হুম!

বলুন। স্পষ্ট কথা শুনতে আমি ভালোবাসি।

আমি আর অমৃত-দ্বীপে গিয়ে অমর-লতার খোঁজ-টোজ করব না।

করবেন না?

না, না, না, নিশ্চয়ই না। আমি অমর হতে চাই না। অমর-লতার খোঁজ তো দুরের কথা, আমি আপনাদের দ্বীপের মাটি পর্যন্ত মাড়াতে রাজি নই।

কেন?

জয়ন্তের কথাটা আমারও মনে লাগছে। অমৃত-দ্বীপে যারা থাকে নিশ্চয় তারাও হচ্ছে। জ্যান্ত মড়া! মড়া যেখানে জ্যান্ত হয়, সে দেশকে আমি ঘেন্না করি। থুঃ থুঃ হুম! আমি জাহাজ থেকে নামব না।

কিন্তু তারা যদি জাহাজে উঠে আপনার সঙ্গে ভাব করতে আসে?

কী! আমার সঙ্গে ভাব করতে আসবে? ইশ, তা আর আসতে হয় না, আমার হাতে বন্দুক আছে কি জন্যে? কিন্তু যেতে দিন ও-সব ছাই কথা, এখন কেবিনের ভেতরে চলুন, খিদের চোটে আমার পেট চোঁ-চোঁ করছে।

মানিক বললে, এইটুকুই হচ্ছে আমাদের সুন্দরবাবুর মস্ত বিশেষত্ব। হাজার ভয় পেলেও উনি খিদে ভোলেন না! হয়তো মৃত্যুকালেও উনি অন্তত এক ডজন লুচি আর একটা গোটা ফাউল-রোস্ট খেতে চাইবেন।

সুন্দরবাবু খ্যাঁক খ্যাঁক করে বলে উঠলেন, মানিক, ফের তুমি ফ্যাচ-ফ্যাচ্ করছ! ফাজিল ছোকরা কোথাকার!

*

লিটল ম্যাজেস্টিক জল কেটে সমুদ্রের নীল বুকে সাদা ফেনার উচ্ছ্বাস রচনা করতে করতে এগিয়ে চলেছে। মেঘশূন্য নীলাকাশ থেকে ঝরে পড়ছে পরিপূর্ণ রৌদ্র।

ক্রমে রোদের আঁচ কমে এল, সূর্যের রাঙা মুখ পশ্চিম আকাশ দিয়ে নামতে লাগল। নীচের দিকে।

কুমার ডেকের ওপরে এসে দেখলে, পূর্বদিকে তাকিয়ে বিমল চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার কাছে গিয়ে বললে, কি শুনছ বিমল? মহাসাগরের চিরন্তন সংগীত?

আমি কিছুই শুনছি না ভাই! আমি এখন পূর্বদিকে একটা দৃশ্য দেখবার চেষ্টা করছি।

সূর্যাস্তের দেরি নেই। এখন তো রঙিন দৃশ্যপট খুলবে পশ্চিম আকাশে। আজ প্রতিপদ, চাঁদও আসবে খানিক পরে। তবে পূর্বদিকে এখন তুমি কি দেখবার আশা করো?

যে আশায় এতদূর এসেছি।

মানে?

কুমার, এইমাত্র দূরবিনে দেখলুম পূর্বদিকে একটি পাহাড়ে ঘেরা দ্বীপকে তার একদিকে রয়েছে পাশাপাশি পাঁচটি শিখর! আমি সেই দিকেই তাকিয়ে আছি। খালি-চোখেও ওকে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তুমি ভালো করে দেখতে চাও তো এই নাও দূরবিন।

কুমার বিপুল আগ্রহে দুরবিনটা নিয়ে তাড়াতাড়ি চোখে তুলে অবাক হয়ে দেখলে, বিমলের কথা সত্য!

ছোট্ট একটি দ্বীপ। তার পায়ে উছলে পড়ে নমস্কার করে বয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের চঞ্চল। ঢেউ এবং তার মাথার ওপরে উড়ছে আকাশের পটে চলচ্চিত্রের মতো সাগর-কপোতরা। পশ্চিম আকাশের রক্তসূর্য যেন নিজের পুঁজি নিঃশেষ করে সমস্ত কিরণমালা জড়িয়ে দিয়েছে ওই দ্বীপবাসী শ্যামল শৈলশ্রেণির শিখরে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, ও যেন মায়াদ্বীপ, চোখকে ফাঁকি দিয়ে ও যেন এখনি ডুব মরতে পারে অতল নীলসাগরে!

ততক্ষণে জয়ন্ত ও মানিকের সঙ্গে সুন্দরবাবুও জাহাজের ধারে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং রামহরিরও সঙ্গে এসেছে বাঘা। দ্বীপটিকে খালি-চোখেও দেখা যাচ্ছিল, সকলে কৌতূহলী হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

কুমার বললে, ওহে বিমল, দ্বীপটি তো দেখছি একরকম পাহাড়ে মোড়া বললেই হয়! পাহাড়ের গা একেবারে খাড়া উঠে গিয়েছে ওপরদিকে অনেকখানি! ও দ্বীপ যেন পাহাড়ের উঁচু পাঁচিল তুলে সমস্ত বাইরের জগৎকে আলাদা করে দিয়েছে, ওর ভেতরে যেন বাইরের মানুষের প্রবেশ নিষেধ। ও-দ্বীপে ঢোকবার পথ কোন দিকে?

বিমল পকেট থেকে অমৃত-দ্বীপের নকশা বার করে বললে, এই দ্যাখো! দ্বীপের উত্তর পশ্চিম কোণে পাঁচ-পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু শিখরওয়ালা পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো। দ্বীপের ভেতর থেকে একটি নদী পাহাড় ভেদ করে সমুদ্রের ওপর এসে পড়েছে। আমাদের দ্বীপে ঢুকতে হবে ওই নদীতেই নৌকো বেয়ে।

সুন্দরবাবু বললেন, আমি আগে থাকতেই জানিয়ে রাখছি, আমায় যেন জাহাজ থেকে নামতে বলা না হয়! কেমন রামহরি, তুমিও তো আমার দলেই?

রামহরি প্রথমটা চুপ করে রইল? তারপর মাথা নাড়তে-নাড়তে বললে, তা হয় না মশাই! খোকাবাবুরা যদি নামেন, আমাকেও নামতে হবে।

সুন্দরবাবু বিস্মিত স্বরে বললেন, সে কি হে রামহরি, ও দ্বীপ যে পিশাচদের দ্বীপ! ওখানে যারা মরে যায় তারাও চলে বেড়ায়!

রামহরি বললে, খোকাবাবুদের জন্যে আমি প্রাণও দিতে পারি।

সূর্য অস্ত গেল। জাহাজ তখন দ্বীপের খুব কাছে। ঘনিয়ে উঠল সন্ধ্যার অন্ধকার। জাহাজ শৈল-দ্বীপের পঞ্চশিখরের তলায় গিয়ে দাঁড়াল।

সমুদ্রের পাখিরা তখন নীরব। আকাশ-আসরেও লক্ষ-লক্ষ তারা প্রতিপদের চন্দ্রের জন্যে রয়েছে মৌন অপেক্ষায়। দ্বীপের ভেতর থেকেও কোনওরকম জীবনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

সমুদ্র কিন্তু সেখানেও বোবা নয়, তার কল্লোলকে শোনাচ্ছে স্তব্ধতার বীণায় অপূর্ব এক গীতিধ্বনির মতো।

তারপর ধীরে-ধীরে উঠল চাঁদ, অন্ধকারের নিকষে রূপোলি আলোর ঢেউ খেলিয়ে।

বিমল বললে, জয়ন্তবাবু, দ্বীপে ঢোকবার নদীর মুখেই আমাদের জাহাজ নোঙর করেছে। এখন যদি বোটে করে আমরা একবার দ্বীপের ভেতরটা ঘুরে আসি?

মানিক বললে, কি সর্বনাশ, এই রাত্রে?

জয়ন্ত বললে, লুকিয়ে খবরাখবর নেওয়ার পক্ষে রাত্রিই তো ভালো সময়, মানিক। চাঁদের ধবধবে আলো রয়েছে, আমাদের কোনওই অসুবিধা হবে না।

বিমল বললে, আজ আমরা দ্বীপের খানিকটা দেখেই ফিরে আসব। আমি, কুমার আর জয়ন্তবাবু ছাড়া আজ আর কারুর যাওয়ার দরকার নেই। ফিরে আসবার পর কাল সকালে আমাদের আসল অভিযান শুরু হবে।

মানিক নারাজের মতন মুখের ভাব করে বললে, কিন্তু যদি আপনারা কোনও বিপদে পড়েন?

বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই সরে পড়ব। নয়তো একসঙ্গে তিনজনেই বন্দুক ছুঁড়ে সঙ্কেত করব। উত্তরে আপনারাও বন্দুক ছুঁড়ে আমাদের জানিয়ে জাহাজের নাবিকদের নিয়ে সদলবলে দ্বীপের ভেতরে প্রবেশ করবেন!

*

চন্দ্রালোকের স্বপ্নজাল ভেদ করে তাদের নৌকা ভেসে চলল দ্বীপের নদীতে নাচতে নাচতে। নৌকোর দাঁড় টানছে বিমল ও জয়ন্ত, হাল ধরেছে কুমার। চুপিচুপি কাজ সারবে বলে তারা নাবিকদেরও সাহায্য নেয়নি।

খানিকক্ষণ নদীর দুই তীরেই দেখা গেল, পাহাড়রা দাঁড়িয়ে আছে চিরস্তব্ধ প্রহরীর মতো। ঘণ্টাখানেক পরে তারা পাহাড়ের এলাকা পার হয়ে গেল।

দুই তীরে তখন চোখে পড়ল মাঝে-মাঝে খোলা জায়গা, মাঝে-মাঝে ছোট-বড় জঙ্গল ও অরণ্য। চাঁদের আলো দিকে দিকে নানা রূপের মতো মাধুরীর ছবি এঁকে রেখেছে, কিন্তু সেদিকে আকৃষ্ট হল না তখন তাদের দৃষ্টি।

দ্বীপের কোথাও যে-কোনও মানুষের চোখ এই সৌন্দর্য উপভোগ করছে, এমন প্রমাণও তারা পেলে না। এ দ্বীপ যেন একেবারে জনহীন–এ যেন সবুজক্ষেত্র, বৃহৎ বনস্পতি ও আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়দের নিজস্ব রাজত্ব!

জয়ন্ত বললে, বিমলবাবু, এই যদি আপনার অমৃত-দ্বীপ হয়, তাহলে বলতে হবে যে এখানকার অমররা হচ্ছে অশরীরী!

বিমল হঠাৎ বললে, কুমার, নৌকোর মুখ তীরের দিকে ফেরাও।

জয়ন্ত বললে, কেন?

ডাঙায় নেমে দ্বীপের ভেতরটা ভালো করে দেখতে চাই।

কিন্তু নৌকো থেকে বেশি দূরে যাওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

বিমল কি জবাব দিতে গিয়েই চমকে থেমে পড়ল। আচম্বিতে অনেক দূর থেকে জেগে উঠল বহুকণ্ঠে এক আশ্চর্য সংগীত! সে গানে পুরুষের গলাও আছে, মেয়ের গলাও আছে! গানের ভাষা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু বিচিত্র তার সুর–অপুর্ব মিষ্টতায় মধুময়।

কুমার চমৎকৃত কণ্ঠে বললে, ও কারা গান গাইছে? ও গান আসছে কোথা থেকে?

বিমল নদীর বাম তীরের দিকে চেয়ে দেখলে। প্রথমটা খোলা জমি, তারপর অরণ্য।

সে বললে, মনে হচ্ছে গান আসছে ওই বনের ভেতর থেকে। নৌকো তীরের দিকে নিয়ে চলো কুমার! কারা ও গান গাইছে সেটা না জেনে ফেরা হবে না।

খানিক পরেই নৌকো তীরে গিয়ে লাগল। বিমল, কুমার ও জয়ন্ত নিজের নিজের বন্দুক নিয়ে ডাঙায় নেমে পড়ল।

বিমল বললে, খুব সাবধানে, চারিদিকে নজর রেখে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

তারা ধীরে-ধীরে অগ্রসর হল নরম ঘাসে ঢাকা এক মাঠের ওপর দিয়ে। সেই অদ্ভুত সম্মিলিত সংগীতের স্বর স্তরে-স্তরে ওপরে–আরও ওপরে উঠছে এবং তার ধ্বনি জাগিয়ে দিচ্ছে বহুদুরের প্রতিধ্বনিকে! সে যেন এক অপার্থিব সংগীত, ভেসে আসছে নিশীথরাতের রহস্যময় বুকের ভেতর থেকে!

যখন তারা বনের কাছে এসে পড়েছে, কুমার হঠাৎ পেছন ফিরে তাকিয়ে চকিত স্বরে বললে, বিমল, বিমল! পিছনে কারা আসছে দ্যাখো!

বিমল ও জয়ন্ত একসঙ্গে ফিরে দাঁড়িয়ে স্তম্ভিত নেত্রে দেখলে, নদীর দিক থেকে সার বেঁধে এগিয়ে আসছে বহুবহু মূর্তি! সংখ্যায় তারা পাঁচ-ছয়শোর কম হবে না!

বিমল মহাবিস্ময়ে বললে, নদীর ধারে তো জনপ্রাণী ছিল না! কোত্থেকে ওরা আবির্ভূত হল?

যেন আকাশ থেকে সদ্য-পতিত এই জনতার দিকে তারা তাকিয়ে রইল আড়ষ্ট নেত্রে। চাঁদের আলোয় দূর থেকে মূর্তিগুলোকে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল না বটে, কিন্তু তাদের মনে হল মূর্তিগুলো মানুষের মূর্তি হলেও, প্রত্যেকেরই ভাবভঙ্গি হচ্ছে অত্যন্ত অমানুষিক!

.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন

যে দল এগিয়ে আসছে তার ভেতরকার প্রত্যেক মূর্তিটাই যেন মানুষের মতন দেখতে কলের পুতুলের মতন। কেবল চলছে তাদের পাগুলো, কিন্তু ওপর-দেহের অংশ একেবারেই কাঠের মতো আড়ষ্ট! তাদের হাত দুলছে না, মাথাগুলোও এদিকে-ওদিকে কোনওদিকেই ফিরছে না! আশ্চর্য!

দূর থেকে কেবল এইটুকুই বোঝা গেল, আর দেখা গেল খালি শত-শত চোখে স্থির আগুনের মতন উজ্জ্বল দৃষ্টি!

কিন্তু অগ্নি-উজ্জ্বল এইসব দৃষ্টি এবং এইসব আড়ষ্ট দেহের চলন্ত পদের চেয়েও অস্বাভাবিক কেমন একটা অজানা-অজানা ভাব মূর্তিগুলোর চারিদিকে কি যেন এক ভূতুড়ে রহস্য সৃষ্টি করেছে!

কুমার শিউরে উঠে তাড়াতাড়ি নিজের বন্দুক তুললে।

বিমল বললে, বন্ধু, অকারণে নরহত্যা করে লাভ নেই।

কুমার বললে, নরহত্যা নয় বিমল, আমি প্রেতহত্যা করব। রামহরি ঠিক বলেছে, এ হচ্ছে পিশাচদের দ্বীপ, এখানে মানুষ থাকে না।

কুমার, পাগলামি কোরো না।

পাগলামি? ওরা কারা? এইমাত্র দেখে এলুম নদীর ধারে জনপ্রাণী নেই, তবু ওরা কোত্থেকে আবির্ভূত হল? ওরা মাটি খুঁড়ে গজিয়ে উঠল, না আকাশ থেকে খসে পড়ল? ওদের আর কাছে আসতে দেওয়া উচিত নয়, বন্দুক ছোড়ো বিমল, বন্দুক ছোড়ো।

বিমল ঘাড় নেড়ে বললে, কি হবে বন্দুক ছুঁড়ে? ওরা যদি একসঙ্গে আক্রমণ করে তাহলে বন্দুক ছুঁড়েও আমরা আত্মরক্ষা করতে পারব না, উলটে বন্দুকের শব্দে সজাগ হয়ে দ্বীপের সমস্ত বাসিন্দা এদিকে ছুটে আসতে পারে।

জয়ন্ত চমৎকৃত স্বরে বললে, বিমলবাবু, এ কি আশ্চর্য ব্যাপার! প্রায় পাঁচশো লোক মাটির ওপরে একসঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে আসছে, তবু কোনওরকম পায়ের আওয়াজই শোনা যাচ্ছে না? এও কি সম্ভব? না, আমরা কি কালা হয়ে গেছি?

কুমার বললে, বিমল, বিমল! তবে কি বিনা বাধায় আমাদের আত্মসমর্পণ করতে হবে? না বন্ধু, এতে আমি রাজি নই।

বিমল বললে, না, আত্মসমর্পণ করব কেন? আমরা ছুটে ওই বনের ভেতরে গিয়ে ঢুকব।

তবে ছোটো! ওরা যে এসে পড়ল!

জয়ন্ত বললে, কিন্তু যারা গান গাইছে তারা ওই বনের ভেতরেই আছে। শেষকালে যদি আমরা দু-দিক থেকে আক্রান্ত হই?

বিমল চটপট চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, মূর্তিগুলো আসছে পশ্চিম দিক থেকে, আর গানের আওয়াজ আসছে পূর্বদিক থেকে। পূর্ব-দক্ষিণ কোণেও রয়েছে বন। চলুন, আমরা ওই দিকেই দৌড় দি।

পূর্ব-দক্ষিণ কোণ লক্ষ করে তিনজনেই বেগে দৌড়তে লাগল। খানিকক্ষণ পরে বন ও মাঠের সীমারেখায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ে তারা আর একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে।

সেই বিচিত্র মুর্তি বৃহৎ দল দ্রুতবেগে তাদের অনুসরণ করেনি, তাদের গতি একটুও বাড়েনি। তারা যেমন ভাবে অগ্রসর হচ্ছিল এখনও ঠিক সেই ভাবেই এগিয়ে আসছে–যেন। তাদের কোনওই তাড়া নেই! তফাতের মধ্যে খালি এই, এখন তারা আসছে পূর্ব-দক্ষিণ দিকে।

বিমল আশ্চর্য হয়ে বললে, ওরা যে আমাদের পেছনে-পেছনে আসছে সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যাপার কি বলো দেখি কুমার? ওরা তো একটুও তাড়াহুড়ো করছে না, রাহু যেমন নিশ্চয়ই চাঁদকে গ্রাস করতে পারবে জেনে এগুতে থাকে ধীরে-ধীরে, ওরাও অগ্রসর হচ্ছে সেইভাবেই! যেন ওরা জানে, যত জোরেই চালাই ওদের কবল থেকে কিছুতেই আমরা পালাতে পারব না!

কুমার বললে, ওদের ধরন-ধারণ দেখলে মনে হয় যেন নিশ্চিত মৃত্যুর দল মূর্তিধারণ করে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে!

জয়ন্ত বললে, ওরা কারা তা জানি না, কিন্তু আমাদের এখানে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়।

বিমল বললে, এখন দেখছি সঙ্গীদের জাহাজে রেখে এসে ভালো কাজ করিনি। এই রহস্যময় দ্বীপে অদৃষ্টে কি আছে জানি না, কিন্তু চলুন, আমরা বনের ভেতরে গিয়ে ঢুকি।

আর এক দৌড়ে তারা মাঠ ছেড়ে বনের ভেতরে গিয়ে পড়ল।

বন সেখানে খুব ঘন নয়, গাছগুলোর তলায়-তলায় ও ফাঁকে-ফাঁকে দেখা যাচ্ছে খানিক কালো আর খানিক আলোয় খেলা। ঝোপঝাড়ের মাঝখান দিয়েও ফুটে উঠেছে আলো কালো মাখা পথের রেখা।

এবং দূর থেকে তখনও ভেসে আসছিল সেই বিচিত্র সংগীতের তান।

কুমার বললে, এখন আমরা কোনদিকে যাব?

বিমল বললে, পূর্ব-দক্ষিণ দিকে আরও খানিক এগিয়ে তারপর আবার আমরা নদীর দিকে ফেরবার চেষ্টা করব।

বিমলের মুখের কথা শেষ হতেই সারা অরণ্য যেন চমকে উঠল কি এক পৈশাচিক হো হো অট্টহাস্যে! তাদের আশপাশ, সুমুখ পেছন থেকে ছুটল হাসির হররার পর হাসির

হররা! সে বিকট হাসির স্রোত বইছে যেন পায়ের তলা দিয়ে, সে হাসি যেন ঝরে ঝরে পড়ছে শূন্যতল থেকে, সে হাসির ধাক্কায় যেন চঞ্চল হয়ে উঠল বনব্যাপী আলোর রেখা, কালোর রেখা!

বিমল, কুমার ও জয়ন্ত বিভ্রান্তের মতো চতুর্দিকে ঘুরে-ফিরে তাকাতে লাগল, কিন্তু কোনওদিকেই দেখা গেল না জনপ্রাণীকে।

জয়ন্ত বললে, কারা হাসে? কোথা থেকে হাসে? কেন হাসে?

কুমার ও বিমল কখনও পাগলের মতো এ-গাছের ও-গাছের দিকে ছুটে যায় কখনও ডাইনের কখনও বাঁয়ের ঝোপঝাড়ের ওপরে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে বারবার আঘাত করে, কিন্তু কোথাও কেউ নেই–অথচ অট্ট-অট্ট হাসির তরঙ্গের-পর-তরঙ্গ আসছে প্রতি ঝোপের ভেতর থেকে, প্রতি গাছের আড়াল থেকে! এ অদ্ভুত হাসির জন্ম যেন সর্বত্রই।

যেমন আচম্বিতে জেগেছিল, তেমনি হঠাৎ আবার থেমে গেল হাসির হুল্লোড়! কেবল শোনা যেতে লাগল সুদূরের সংগীতলহরী।

বিমল কান পেতে শুনে বললে, জয়ন্তবাবু, এবারে কেবল গান নয়, আর একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছেন?

জয়ন্ত বললে, হুঁ। বনময় ছড়ানো শুকনো পাতার ওপরে পড়ছে যেন তালে-তালে শত শত পা! বোধহয় মাঠের বন্ধুরা বনে ঢুকছে, কিন্তু এবারে তারা আর নিঃশব্দে আসছে না।

বিমল বললে, ছোট কুমার, যত জোরে পারো ছোট। আবার জাগ্রত হল বহুকণ্ঠে সেই ভীষণ অট্টহাস্য!

কুমার বললে, কিন্তু কোন দিকে ছুটব বিমল? দূরে শত্রুদের পদশব্দ, আশেপাশে শত্রুদের পাগলা হাসির ধূম! চারিদিকে অদৃশ্য শত্রু, কোনদিকে যাব ভাই?

সামনের দিকে সামনের দিকে। শত্রুরা দৃশ্যমান হলেই বন্দুক ছুড়বে।

তিনজনে আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগল এবং তাদের সঙ্গে-সঙ্গেই ছুটতে লাগল যেন। সেই বেয়াড়া হাসির আওয়াজ! এইটুকুই কেবল বোঝা গেল যে, তাদের এপাশে-ওপাশে পেছনে জাগ্রত অট্টহাসি থাকলেও সামনের দিকে হাসি এখন একেবারেই নীরব। যেন সেই অপার্থিব হাসি তাদের সুমুখের পথ রোধ করতে চায় না! যেন কারা তাদের ওইদিকেই তাড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়!

প্রায় বারো-তেরো মিনিট ধরে তারা ছুটে চলল এইভাবেই এবং এরমধ্যে সেই হাসির স্রোত বন্ধ হল না একবারও।

তার পরেই থেমে গেল হাসি, শেষ হয়ে গেল বনের পথ এবং সামনেই দেখা গেল পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে খুব উঁচু একটা প্রাচীর।

কুমার হতাশভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, সামনের পথ বন্ধ! এখন আমরা কি করব?

বিমল ও জয়ন্ত উপায়হীনের মতো এদিকে-ওদিকে তাকাতে লাগল।

হঠাৎ বনের ভেতরে জাগল আবার শত-শত পায়ের আঘাতে শুকনো পাতার আর্তনাদ।

জয়ন্ত বললে, এবারে পায়ের শব্দ আসছে আমাদের দুপাশ আর পিছন থেকে। আমাদের সুমুখে রয়েছে খাড়া দেওয়াল। আর আমাদের পালাবার উপায় নেই।

বিমল ম্লান হাসি হেসে বললে, আমরা পালাচ্ছি না–রিট্রিট করছি।

জয়ন্তও হাসবার চেষ্টা করে বললে, বেশ, মানলুম এসব হচ্ছে আমাদের ট্যাকটিক্যাল মুভমেন্টস; কিন্তু এবারে আমরা কোন দিকে যাত্রা করব?

বিমল বললে, সামনের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখুন, আমাদের সুমুখের দেওয়ালের গায়ে রয়েছে একটা ছোট দরজা! ওর পাল্লাও বন্ধ নেই।

জয়ন্ত দুই পা এগিয়ে ভালো করে দেখে বুঝলে, বিমলের কথা সত্য! তারপর বললে, দেখছি, অন্ধকারে আপনার চোখ আমাদের চেয়ে ভালো চলে। কিন্তু ওর ভেতরে ঢুকলে কি আর আমরা বেরিয়ে আসতে পারব? বেশ বোঝা যাচ্ছে, দুই পাশের আর পেছনের অদৃশ্য শত্রুরা অট্টহাস্য আর পায়ের শব্দ করে আমাদের এই দিকেই তাড়িয়ে আনতে চায়। শিকারীরা বাঘ-সিংহকে যেমনভাবে নির্দিষ্ট পথে চালনা করে ফাঁদে ফেলে, শত্রুরাও সেই কৌশল অবলম্বন করেছে।

বিমল বললে, ঠিক। তাদের উদ্দেশ্য আমিও বুঝতে পেরেছি। আর আমাদের ঢোকবার সুবিধা হবে বলে দয়া করে তারা দরজার পাল্লা-দুখানাও খুলে রেখেছে! অতএব তাদের ধন্যবাদ দিয়ে আমাদের এখন দরজার ফাঁকেই মাথা গলাতে হবে, কারণ পায়ের শব্দ আর দূরে নেই!

কুমার বললে, দরজার ওপাশে যদি নতুন বিপদ থাকে?

অকুতোভয়ে সেই বিপদকে আমরা বরণ করব–বলেই বিমল বন্দুক উদ্যত করে সর্বাগ্রে দরজার ভেতরে গিয়ে ঢুকল। তার পেছনে-পেছনে গেল কুমার ও জয়ন্ত!

ভেতরে ঢুকে তারা অবাক হয়ে দেখলে, একটা বৃক্ষহীন, তৃণহীন ছোটখাটো ময়দানের মতন জায়গা এবং তার চারিদিকেই প্রায় চারতলার সমান উঁচু প্রাচীর। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, যেন সর্বহারা মরুভূমির খাঁ-খাঁ করা ভয়াল স্তব্ধতাকে সেখানে কেউ প্রাচীর তুলে কয়েদ করে রেখেছে!

জয়ন্ত বললে, এর মানে কি? একটা মাঠকে এমন উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে কেন?

বিমল অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, অনেকদিন আগে আমরা গিয়েছিলুম চম্পাদ্বীপে। কুমার, আজকের এই গর্জন শুনে কি সেখানকার কোনও-কোনও জীবের কথা মনে পড়ে না?

কুমার বললে, এরা কি এখানে আমাদের বন্দি করে রাখতে চায়?

যেন তার জিজ্ঞাসার উত্তরেই তাদের পিছনকার দরজার পাল্লা দু-খানা বন্ধ হয়ে গেল। সশব্দে।

বিমল দৌড়ে গিয়ে দরজা ধরে টানাটানি করে বললে, হা কুমার, অমৃত-দ্বীপে এসে। আমাদের ভাগ্যে উঠবে বোধহয় নিছক গরলই। এ দরজা এমন মজবুত যে মত্ত হস্তিও এর কিছুই করতে পারবে না! এতক্ষণ লক্ষ করে দেখিনি, কিন্তু এ হচ্ছে পুরু লোহার দরজা; আর এই পাঁচিল হচ্ছে পাথরের। এই দরজা আর পাঁচিল ভাঙতে হলে কামানের দরকার!

অকস্মাৎ চারিদিকের নিস্তব্ধতা খণ্ডখণ্ড হয়ে গেল ভয়াবহ গর্জনের-পর-গর্জনে! সে যে কি বিকট, কি বীভৎস, কি ভৈরব হুঙ্কার, ভাষায় তা প্রকাশ করা অসম্ভব। পৃথিবীর মাটি, আকাশের চাঁদ-তারা, নিশীথ-রাতের বুক সে হুঙ্কার শুনে যেন কেঁপে কেঁপে-কেঁপে উঠল! যেন বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় ছটফট করতে করতে বহু দিনের উপবাসী কোন অতিকায় দানব হিংস্র, বিষাক্ত চিৎকারের-পর-চিৎকার করে হঠাৎ আবার স্তব্ধ হয়ে পড়ল!

বিমল, কুমার ও জয়ন্ত খানিকক্ষণ স্তম্ভিত ও বোবার মতন দাঁড়িয়ে রইল।

সর্বপ্রথমে কথা কইলে জয়ন্ত; কম্পিতস্বরে সে বললে, এ কোন জীবের গর্জন বিমলবাবু? চল্লিশ-পঞ্চাশটা সিংহও যে একসঙ্গে এত জোরে গর্জন করতে পারে না! এ-রকম ভয়ানক গর্জন করবার শক্তি কি পৃথিবীর কোনও জীবের আছে?

কুমার বললে, মনে-মনে আমিও সেই কথাই ভাবছিলুম!

বিমল বললে, কিন্তু আন্দাজ করতে পারছ কি এ জীবটা কোত্থেকে গর্জন করছে? মনে হচ্ছে যেন সে আছে আমাদের খুব কাছেই। অথচ এই পাঁচিল ঘেরা জায়গাটার মধ্যে চাঁদের আলোর কোনও জীবের ছায়া পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না!

জয়ন্ত বললে, কিন্তু পূর্বদিকে খানিক দূরে তাকিয়ে দেখুন। ওখানে চাঁদের আলোর জলের মতন কি চকচক করছে না?

বিমল খানিকক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, হ্যাঁ জয়ন্তবাবু, ওখানে একটা জলাশয়ের মতন কিছু আছে বলেই মনে হচ্ছে!

কুমার বললে, একটু এগিয়ে দেখব নাকি?

বিমল খপ করে কুমারের হাত চেপে ধরে বললে, খবরদার কুমার, ওদিকে যাওয়ার নামও কোরও না।

কেন বিমল, ওদিকে তো কেউ নেই?

হ্যাঁ, চোখে কারুকে দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু আগে এখানকার ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝে দ্যাখো। প্রথমে ধরো, রীতিমতো মাঠের মতন এমন একটা জায়গা অকারণে কেউ এত উঁচু পাথরের পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখে না। এখানটা ঘিরে রাখবার কারণ কি? দ্বিতীয়ত, পাঁচিলের ওই দরজা পুরু লোহা দিয়ে তৈরি কেন? এই ফর্দা জায়গায় এমনকী বিভীষিকা আছে যাকে এখানে ধরে রাখবার জন্যে অমন মজবুত দরজার দরকার হয়? তৃতীয়ত, পাঁচিল-ঘেরা এতখানি জায়গার ভেতরে দ্রষ্টব্য আর কিছুই নেই–না গাছপালা, না ঘরবাড়ি, না জীবনের চিহ্ন! আছে। কেবল একটা জলাশয়! কেন ওখানে জলাশয় খখাড়া রয়েছে, ওর ভেতরে কি আছে? আমাদের খুব কাছে এখনি যে দানব-জানোয়ারটা বিষম গর্জন করলে, কে বলতে পারে সে ওই জলাশয়ে বাস করে কিনা? হয়তো সে উভচর–জলে-স্থলে তার অবাধ গতি! ওদিকে যাওয়া নিরাপদ নয় কুমার, ওদিকে যাওয়া নিরাপদ নয়।

জয়ন্ত শিউরে উঠে বললে, তবে কি ওই দানবের খোরাক হওয়ার জন্যেই আমাদের তাড়িয়ে এইখানে নিয়ে আসা হয়েছে?

আমার তো তাই বিশ্বাস।

কুমার বললে, ওই বিভীষিকা যদি স্থলচর হয়, তাহলে আমরা তো এখানে থেকেও বাঁচতে পারব না! সে তো আমাদের দেখতে পেলেই আক্রমণ করবে! তখন কি হবে?

তখন ভরসা আমাদের এই তিনটে অটোমেটিক বন্দুক! কিন্তু এই বন্দুক তিনটে যে নিশ্চয়ই আমাদের প্রাণরক্ষা করতে পারবে একথা জোর করে বলা যায় না! চম্পাদ্বীপে আমরা এমন সব জীবও স্বচক্ষে দেখেছি যাদের কাছে বন্দুকও হচ্ছে তুচ্ছ অস্ত্র।

জয়ন্ত কিছু না বলে প্রাচীরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর প্রাচীরের গায়ে হাত বুলিয়ে বললে, দেখছি পাঁচিলের গা তেলা নয়, রীতিমতো এবড়ো-খেবড়ো। ভালো লক্ষণ।

বিমল বললে, পাঁচিলের গা অসমতল হলে আমাদের কি সুবিধা হবে জয়ন্তবাবু?

জয়ন্ত সে-কথার জবাব না দিয়ে বললে, বিমলবাবু, যদি একগাছা হাত-চল্লিশ-পঞ্চাশ লম্বা দড়ি পেতুম, তাহলে আমাদের আর কোনওই ভাবনা ছিল না।

বিমল বিস্মিত স্বরে বললে, দড়ি? দড়ি নিয়ে কি করবেন? দড়ি তো আমার কাছেই আছে! জয়ন্তবাবু, আমি আর কুমার হচ্ছি পয়লা নম্বরের ভবঘুরে, পথে পা বাড়ালেই সবকিছুর জন্যেই প্রস্তুত হয়ে থাকি। আমাদের দুজনের পাশে ঝুলছে এই যে দুটো ব্যাগ, এর মধ্যে আছে দস্তুরমতো সংসারের এক-একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। আমার ব্যাগে আছে ষাট হাত ম্যানিলা দড়ি। জানেন তো, দেখতে সরু হলেও ম্যানিলা দড়ি দিয়ে সিংহকেও বেঁধে রাখা যায়?

জয়ন্ত বললে, উত্তম। আর চাই একটা হাতুড়ি আর একগাছা হুক।

ও দুটি জিনিস আছে কুমারের ব্যাগে।

চমৎকার! তাহলে আমার সঙ্গে আসুন। আমি চাই চার পাঁচিলের একটা কোণ বেছে নিতে, সেখানে গেলে হাত বাড়িয়ে পাব দু-দিকের দেওয়াল।

জয়ন্ত পায়ে-পায়ে এগুলো। কিছুই বুঝতে না পেরে বিমল ও কুমারও চলল তার পেছনে পেছনে।

প্রাচীরের পূর্ব-উত্তর কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত বললে, এইবারে দড়ি আর হুক আর হাতুড়ি নিয়ে আমি উঠব পাঁচিলের ওপরে। তারপর টঙে গিয়ে দুখানা পাথরের জোড়ের মুখে হুক বসিয়ে তার সঙ্গে দড়ি বেঁধে নীচে ঝুলিয়ে দেব। তারপর আপনারা দুজনেও একে একে দড়ি ধরে ওপরে গিয়ে উঠবেন। তারপর সেই দড়ি বেয়েই পাঁচিলের ওপারে পৃথিবীর মাটিতে অবতীর্ণ হতে বেশিক্ষণ লাগবে না।

বিমল খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, বাঃ, সবই তো জলের মতন বেশ বোঝা গেল! কিন্তু জয়ন্তবাবু, প্রথমেই বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে? অর্থাৎ পাঁচিলের টঙে গিয়ে চড়বে কে? আপনি, না আমি, না কুমার? দুঃখের বিষয় আমরা কেউই টিকটিকির মূর্তিধারণ করতে পারি না!

জয়ন্ত বললে, বিমলবাবু, আমি ঠাট্টা বা আকাশকুসুম চয়ন করছি না। কিছুকাল আগে নিউইয়র্ক টাইমসে আমি কারাগার থেকে পলায়নের এক আশ্চর্য খবর পড়েছিলুম। কাল্পনিক নয়, সম্পূর্ণ সত্যকাহিনি। আমেরিকার এক নামজাদা খুনে ডাকাতকে সেখানকার সবচেয়ে সুরক্ষিত জেলখানায় বন্দি করে রাখা হয়। সে-জেল ভেঙে কোনও বন্দি কখনও পালাতে পারেনি, তার চারিদিকে ছিল অত্যন্ত উঁচু পাঁচিল। কিন্তু ওই ডাকাতটা এক অদ্ভুত উপায়ে সেই পাঁচিলও পার হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। উপায়টা যে কি, মুখে বললে আপনারা তা অসম্ভব বলে মনে করবেন–আর খবরটা প্রথমে পড়ে আমিও অসম্ভব বলেই ভেবেছিলুম। কিন্তু কিছুদিন ধরে অভ্যাস করবার পর আমিও দেখলুম, উপায়টা দুঃসাধ্য হলেও অসাধ্য নয়। তবে সাধারণ মানুষের পক্ষে এ উপায়টা

চিরদিনই অসম্ভব হয়ে থাকবে বটে, কারণ এ উপায় যে অবলম্বন করবে তার পক্ষে দরকার কেবল হাত-পায়ের কৌশল নয়–অসাধারণ দেহের শক্তিও।

বিমল কৌতূহলে প্রদীপ্ত হয়ে বললে, জয়ন্তবাবু, শিগগির বলুন, সে উপায়টা কি?

জয়ন্ত বললে, উপায়টা এমন ধারণাতীত যে মুখে বললে আপনারা বিশ্বাস করবেন না। তার চেয়ে এই দেখুন, আপনাদের চোখের সমুখে আমি নিজেই সেই উপায়টা অবলম্বন করছিবলেই সে দুই দিকের প্রাচীর যেখানে মিলেছে সেই কোণে গিয়ে দাঁড়াল।

তারপর বিমল ও কুমার যে অবাক করা ব্যাপারটা দেখলে কোনওদিনই সেটা তারা সম্ভবপর বলে মনে করেনি! জয়ন্ত কোণে গিয়ে দুই দিকের প্রাচীরে দুই হাত ও দুই পা রেখে কেবল হাত ও পায়ের ওপরে প্রবল চাপ দিয়ে ওপরদিকে উঠে যেতে লাগল, প্রায় অনায়াসেই! বিপুল বিস্ময়ে নির্বাক ও রুদ্ধশ্বাস হয়ে তারা বিস্ফারিত চোখে ওপর-পানে তাকিয়ে রইল।

জয়ন্ত যখন প্রাচীরের ওপর পর্যন্ত পৌঁছল, বিমল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তারিফ করে বললে, সাধু জয়ন্তবাবু, সাধু! আপনি আজ সত্য করে তুললেন ধারণাতীত স্বপ্নকে!

ঠিক সেই সময়েই জাগল আবার চারিদিক কাঁপয়ে ও ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে কোন অজ্ঞাত দানবের বিভীষণ হুহুঙ্কার। সে যেন সমস্ত জীবজগতের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ–সে যেন বিরাট বিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা!

জয়ন্ত তখন প্রাচীরের ওপরে উঠে বসে হাঁপ নিচ্ছে, কিন্তু এমন ভয়ানক সেই চিৎকার যে, চমকে উঠে সে আর একটু হলেই টলে নীচে পড়ে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি দুই হাতে প্রাচীর চেপে ধরে সরোবরের দিকে সভয়ে তাকিয়ে দেখলে।...হা, বিমলের অনুমানই ঠিক। একটু আগে যারা আজগুবি হাসি হাসছিল তারা দেখা দেয়নি বটে, কিন্তু এখন যে হুঙ্কারের-পর-হুঙ্কার ছাড়ছে সে আর অদৃশ্য হয়ে নেই!

চাঁদ তখন পশ্চিম আকাশে। এবং পশ্চিম দিকের উঁচু প্রাচীরের কালো ছায়া এসে পড়ে সরোবরের আধাআধি অংশ করে তুলেছে অন্ধকারময়। এবং সেই অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ে অন্ধকারেরই একটা জীবন্ত অংশের মতো কী যে সে কিম্ভুতকিমাকার বিপুল মূর্তির খানিকটা আত্মপ্রকাশ করেছে, দূর হতে স্পষ্ট করে তা বোঝা গেল না। কিন্তু তার প্রকাণ্ড দেহটা সরোবরের জ্যোৎস্না-উজ্জ্বল অংশের ওপরে ক্রমেই আরও প্রকাণ্ড হয়ে উঠতে লাগল! তবে কি সে তাদের দেখতে পেয়েছে? সে কি এগিয়ে আসছে জল ছেড়ে ডাঙায় ওঠবার জন্যে?

জয়ন্ত অত্যন্ত ব্যস্তভাবে প্রাচীরের পাথরের ফাঁকে হুক বসিয়ে ঠকঠক হাতুড়ির ঘা মারতে লাগল।

নীচে থেকে বিমল অধীর স্বরে চিৎকার করে বললে, ও আমাদের দেখতে পেয়েছে– ও আমাদের দেখতে পেয়েছে! জয়ন্তবাবু, দড়ি–দড়ি!

কুমার ফিরে সচকিত চোখে দেখলে, প্রায় আশি ফুট লম্বা ও পঁয়ত্রিশ- চল্লিশ ফুট উঁচু একটা বিরাট কালি কালো দেহ মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের মতো সরোবরের তীরে বসে সশব্দে প্রচণ্ড গা-ঝাড়া দিচ্ছে!

ওপর থেকে ঝপাং করে একগাছা দড়ি নীচে এসে পড়ল।

কুমার এস্ত স্বরে বললে, লাউ-জুর ভক্তেরা কি একেই ড্রাগন বলে ডাকে?

বিমল দড়ি চেপে ধরে বলল, চুলোয় যাক নাউজুর ভক্তরা! এখন নিজের প্রাণ বাঁচাও। তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গেই দড়ি ধরে ওপরে উঠে এসো।

–– ––

তারা একে-একে প্রাচীরের ওপারে মাটির ওপরে গিয়ে নেমে আড়ষ্টভাবে শুনলে, ওধার থেকে ঘনঘন জাগছে মহাক্রুদ্ধ দানবের হতাশ হুহুঙ্কার! সে নিশ্চয়ই চারিদিকে মুখের গ্রাস

খুঁজে বেড়াচ্ছে, কেন না তার বিপুল দেহের বিষম দাপাদাপির চোটে প্রাচীরের এ-পাশের মাটিও কেঁপে উঠছে থরথর করে।

কুমার শ্রান্তের মতন কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললে, উঃ, দানবটা আর এক মিনিট আগে আমাদের দেখতে পেলে আর আমরা বাঁচতুম না!

বিমল গম্ভীর স্বরে বললে, এখনও আমাদের বাঁচবার সম্ভাবনা নেই কুমার! ডাইনে বাঁয়ে সামনের দিকে চেয়ে দ্যাখো!

সর্বনাশ! আবার সেই অপার্থিব দৃশ্য! তারা দাঁড়িয়ে আছে প্রান্তরের মতন একটা স্থানে এবং সেই প্রান্তরের যেদিকে তাকানো যায় সেই দিকেই চোখে পড়ে, কলে-চলা পুতুলের মতন দলে-দলে মানুষ-মূর্তি অর্ধচন্দ্রাকারে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে! নীরব, নিঃশব্দ, নিষ্ঠুর সব মূর্তি।

পেছনে প্রাচীর এবং সামনে ও দুই পাশে রয়েছে এই অমানুষিক মানুষের দল। এবারে আর পালাবার কোনও পথই খোলা নেই।

জয়ন্ত অবসন্নের মতো বসে পড়ে বললে, আর কোনও চেষ্টা করা বৃথা।

.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । দ্বীপের নিরুদ্দেশ যাত্রা

সেই ভয়ানক অর্ধচন্দ্র ব্যূহ এমনভাবে তিন দিক আগলে এগিয়ে আসছে যে, মুক্তিলাভের কোনও পথই আর ভোলা রইল না।

ব্যূহ যারা গঠন করেছে তাদের দিকে তাকালেও বুক করতে থাকে ছাঁৎ-ছাঁৎ! তারা মানুষ, না অমানুষ? তারা যখন মাটির ওপরে পদ সঞ্চালন করে অগ্রসর হচ্ছে তখন তাদের জ্যান্ত মানুষ বলেই না মেনে উপায় নেই, কিন্তু দেখলে মনে হয়, যেন দলে-দলে কবরের

মড়া হঠাৎ কোনও মোহিনী মন্ত্রে পদচালনা করবার শক্তি অর্জন করেছে! এবং এবারেও সবাই লক্ষ করলে যে, কেবল দুই পা ছাড়া তাদের প্রত্যেকেরই অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঠিক যেন মৃত্যু আড়ষ্ট হয়ে আছে!

অর্ধচন্দ্র-ব্যূহের দুই প্রান্ত বিমলদের পেছনকার প্রাচীরের দুই দিকে সংলগ্ন হল, মাঝে থাকল একটুখানি মাত্র ফাঁক, যেখানে অবাক ও অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারা তিনজনে।

এদের উদ্দেশ্য কি? এরা তাদের বন্দি করতে, না বধ করতে চায়? ওদের মুখ দেখে কিছু বোঝা অসম্ভব, কারণ মড়ার মুখের মতন কোনও মুখই কোনও ভাব প্রকাশ করছে না–কেবল তাদের অপলক চোখে চোখে জ্বলছে যেন নিষ্কম্প অগ্নিশিখা, যা দেখলে হয় হৃৎকম্প।

কুমার মরিয়ার মতন চিৎকার করে বললে, কপালে যা আছে বুঝতেই পারছি, আমি কিন্তু পোকার মতন ওদের পায়ের তলায় পড়ে প্রাণ দিতে রাজি নই–যতক্ষণ শক্তি আছে বিমল, বন্দুক ছোড়ো, বন্দুক ছোড়!

সঙ্গে-সঙ্গে শত-শত কণ্ঠে আবার জাগল অট্টহাস্যর-পর-অট্টহাস্যের উচ্ছ্বাস!

সঙ্গে-সঙ্গে প্রাচীরের ওপার থেকেও ভীষণ হুঙ্কার করে সাড়া দিতে লাগল সেই শিকার বঞ্চিত হতাশ দানব জন্তুটা!

সেই সমান-ভয়াবহ হাস্য ও গর্জনের প্রচণ্ডতায় চতুর্দিক হয়ে উঠল যেন বিষাক্ত!

ও-দানবটা যেন চাঁচাচ্ছে পেটের জ্বালায় অস্থির হয়ে, কিন্তু এই মূর্তিমান প্রেতগুলো এত হাসে কেন?

বিমল বললে, জাহাজের সঙ্গে-সঙ্গে সমুদ্রে যে মূর্তিটা ভেসে আসছিল, তাকেও দেখতে ঠিক এদেরই মতো। সে-ও হয়তো এই দলেই আছে।

কুমার তখন তার বন্দুক তুলেছিল। কিন্তু হঠাৎ কি ভেবে বন্দুক নামিয়ে বললে, বিমল, বিমল, একটা কথা মনে হচ্ছে!

কি কথা?

লাউ-ৎজুর মূর্তিটা আমার সঙ্গেই আছে। জান তো, তাও সাধুরা বলে সে মূর্তি মন্ত্রপূত আর তাকে সঙ্গে না আনলে এ-দ্বীপে আসা যায় না?

বিমল কতকটা আশ্বস্ত স্বরে বললে, ঠিক বলেছ কুমার, এতক্ষণ ওকথা আমি ভুলেই গিয়েছিলুম! ওই মূর্তির লোভেই কলকাতায় মানুষের-পর-মানুষ খুন হয়েছে। তার এত মহিমা কীসের, এইবারে হয়তো বুঝতে পারা যাবে! বার করো তো একবার মূর্তিটাকে, দেখি সেটা দেখে এই ভূতগুলো কি করে?

কুমার তাড়াতাড়ি ব্যাগের ভেতর থেকে জেডপাথরে গড়া, রামছাগলে চড়া সাধক লাউ-জুর সেই অর্ধতপ্ত অর্ধ-শীতল মূর্তিটা বার করে ফেললে এবং ডানহাতে করে এমনভাবে তাকে মাথার ওপরে তুলে ধরলে যে, সকলেই তাকে স্পষ্ট দেখতে পেলে।

ফল হল কল্পনাতীত!

মুহূর্তের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল অট্টহাস্য এবং আচম্বিতে যেন কোন অদৃশ্য বৈদ্যুতিক শক্তির ধাক্কা খেয়ে সেই শত-শত আড়ষ্টমূর্তি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি পিছিয়ে যেতে-যেতে ছত্রভঙ্গ হয়ে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল!

জয়ন্ত, বিমল ও কুমার-তিনজনেই অত্যন্ত বিস্মিতের মতো একবার এ-ওর মুখের দিকে এবং একবার সেই পশ্চাৎপদ বীভৎস মূর্তিগুলোর দিকে ফিরে-ফিরে তাকাতে লাগল বারংবার!

অবশেষে হাঁপ ছেড়ে জয়ন্ত বললে, এতটুকু মূর্তির এত বড় গুণ, একথা যে বিশ্বাস করতেও প্রবৃত্তি হচ্ছে না!

বিমল বললে, এতক্ষণে বোঝা গেল, এই দ্বীপে ওই পবিত্র মুর্তিই হবে আমাদের রক্ষাকবচের মতো। ওকে সঙ্গে করে এখন আমরা যেখানে খুশি যেতে পারি।

জয়ন্ত বললে, না বিমলবাবু, না! এই সৃষ্টিছাড়া দ্বীপ আমাদের মতন মানুষের জন্যে তৈরি হয়নি। এখানে পদে-পদে যত সব অস্বাভাবিক বিপদ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে, এরপর হয়তো লাউ-জুর মুর্তিও আর আমাদের বাঁচাতে পারবে না। আমি চাই নদীর ধারে যেতে, যেখানে বাঁধা আছে আমাদের নৌকা!

কুমার বললে, আপাতত আমিও জয়ন্তবাবুর কথায় সায় দি। আবার যদি এখানে আসি, দলে ভারী হয়েই আসব। কিন্তু নদী কোন দিকে?

বিমল বললে, নিশ্চয়ই পশ্চিম দিকে! ওই দ্যাখো, চাঁদের আলো নিবে আসছে, পূর্বের আকাশ ফরসা হচ্ছে!

যেন সমুজ্জ্বল স্বপ্নের মতো স্নিগ্ধতার মধ্যে দেখা গেল, প্রান্তরের মাঝে-মাঝে দাঁড়িয়ে আছে তালজাতীয় তরুকুঞ্জ ও ছোট-ছোট বন। এতক্ষণ যারা এসে এখানে বিভীষিকা সৃষ্টি করছিল সেই অপার্থিব মূর্তিগুলো এখন অদৃশ্য হয়েছে চোখের আড়ালে, কোথায়!

বিমল সব দিকে চোখ বুলিয়ে বললে, আর বোধ হয় ওরা আমাদের ভয় দেখাতে আসবে না! চলল কুমার, আমরা ওই বনের দিকে যাই। খুব সম্ভব, ওই বনের পরেই পাব নদী।

তারা বন লক্ষ করে অগ্রসর হল এবং চলতে-চলতে বারবার শুনতে লাগল, সেই অজানা অতিকায় জানোয়ারটা তখনও আকাশ কাঁপিয়ে দারুণ ক্রোধে চিৎকার করছে ক্রমাগত!

প্রায় সিকি মাইল পথ চলবার পর বনের কাছে এসে তারা শুনতে পেলে, গাছে গাছে জেগে উঠে ভোরের পাখিরা গাইছে নতুন উষার প্রথম জয়গীতি। আঁধার তখন নিঃশেষে পালিয়ে গেছে কোথায় কোন দুঃস্বপ্নলোকের অন্তঃপুরে।

দানবের চিৎকারও থেমে গেল। হয়তো সেও ফিরে গেল হতাশ হয়ে তার পাতালপুরে। হয়তো রাত্রির জীব সে, সূর্যালোক তার চোখের বালি।

বাতাসও এতক্ষণ ছিল যেন শ্বাসরোধ করে, এখন ফিরে এল নিয়ে তার স্নিগ্ধ স্পর্শ, বনে-বনে সবুজ গাছের পাতায়-পাতায় জাগল নির্ভীক আনন্দের বিচিত্র শিহরন!

জয়ন্ত বললে, এই তো আমার চির-পরিচিত প্রিয় পৃথিবী! জানি এর আলো-ছায়ার মিলন-লীলাকে, এর শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের মাধুর্যকে, এর ফুল ফোঁটানো শ্যামলতাকে, আমি বাঁচতে চাই এদেরই মাঝখানে! কালকের মতো যুক্তিহীন আজগুবি রাত আর আমার জীবনে কখনও যেন না আসে! এ-রাতের কাহিনি কারুর কাছে মুখ ফুটে বললেও সে আমাকে পাগল বলে মনে করবে!

ঠিক সেই সময়ে কী এক অভাবনীয় ভাবে সকলের মন অভিভূত হয়ে গেল।

প্রথমটা সবিস্ময়ে কারণ বোঝবার চেষ্টা করেও কেউ কিছুই বুঝতে পারলে না।

তার পরেই কুমার বললে, একি বিমল, একি! ভূমিকম্প, হচ্ছে নাকি?

চারিদিকে একবার চেয়ে বিমল বললে, এ তো ঠিক ভূমিকম্পের মতন মনে হচ্ছে না কুমার! মনে হচ্ছে, আমরা আছি টলমলে জলে নৌকার ওপরে! একি আশ্চর্য!

জয়ন্ত বললে, দেখুন দেখুন, ওইদিকে তাকিয়ে দেখুন! যে মাঠ দিয়ে আমরা এসেছি, সেখানে হঠাৎ এক নদীর সৃষ্টি হয়েছে! আঁঃ এও কি সম্ভব?

বিপরীত দিকে তাকিয়ে কুমার বললে, ওদিকেও যে ওই ব্যাপার! আমরা যে জমির ওপরে দাঁড়িয়ে আছি তার দুই দিকেই নদীর আবির্ভাব হয়েছে!

দুই হাতে চোখ কচলে চমৎকৃত কণ্ঠে বিমল বললে, এ তো দৃষ্টি বিভ্রম নয়! কুমার, আমাদের সামনের দিকেও খানিক তফাতে চেয়ে দেখ। ওখানেও জল! পেছনদিকে বন ভেদ করে চোখ চলছে না, খুব সম্ভব ওদিকেও আছে জল! কারণ এটা বেশ বুঝতে পারছি যে, আমরা আছি এখন দ্বীপের মতন একটা জমির ওপরে, আর এই দ্বীপটা ভেসে যাচ্ছে ঠিক নৌকোর মতোই! না, এইবারে আমি হার মানলুম! দ্বীপ হল নৌকো! না এটাকে বলব ভাসন্ত। দ্বীপ?

সত্য! জলের ওপারে প্রান্তরের বনজঙ্গল দেখতে-দেখতে পেছনে সরে যাচ্ছে–যেমন সরে যেতে দেখা যায় রেলগাড়ির ভেতরে বা নৌকো-জাহাজের ওপরে গিয়ে বসলে! গঙা সাঁতার কাটছে জলে!

বিমল অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, জয়ন্তবাবু আপনি হ্যাঁমার্টনের ইউনিভার্সাল হিস্ট্রি অফ দি ওয়ার্ল্ড পড়েছেন?

রেখে দিন মশাই, হিস্ট্রি-ফিস্ট্রি! আমার মাথা এমন বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে! নিজেকে আর জয়ন্ত বলেই মনে হচ্ছে না!

শুনুন। ওই হিস্ট্রির ষষ্ঠ খণ্ডে ৩৫২২ পৃষ্ঠায় একখানি ছবি দেখবেন। চার-পাঁচ শ বছর আগে চিনদেশে সিং-রাজবংশের সময়ে একজন চিনা পটুয়া অমৃত-দ্বীপের যে চিত্র এঁকেছিলেন, ওখানি হচ্ছে তারই প্রতিলিপি। তাতে দেখা যায়, জনকয় তাও-ধর্মাবলম্বী লোক একটি ভাসন্ত দ্বীপে বসে পানভোজন আমোদ-আহ্লাদ করছে, আর একটি মেয়ে হাল ধরে দ্বীপটিকে করছে নির্দিষ্ট পথে চালনা!

আরে মশাই, কবি আর চিত্রকররা উদ্ভট কল্পনায় যা দেখে, তাই কি আমাদেরও বিশ্বাস। করতে হবে?

জয়ন্তবাবু, সময়-বিশেষে কল্পনাও যে হয় সত্যের মতো, আর সত্যও হয় কল্পনায় মতো, আজ স্বচক্ষেও তা দেখে আপনি তাকে স্বীকার করবেন না।

পাগলের কাছে সবই সত্য হতে পারে। আমাদের সকলেরই মাথা হঠাৎ বিগড়ে গেছে।

না জয়ন্তবাবু, শিশুরও কাছে সবই সত্য হতে পারে। এই লক্ষ-কোটি বৎসরের অতি বৃদ্ধ পৃথিবীর কোলে ক্ষুদ্র মানুষ হচ্ছে শিশুর চেয়ে শিশু। সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরেও যে অসাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম থাকতে পারে, ভালো করে তা জানতে পারবার আগেই ক্ষণজীবী মানুষের মৃত্যু হয়। আজ লোহা জলে ভাসে, ধাতু আকাশে ওড়ে, বন্দি বিদ্যুৎ গোলামি করে, শূন্য দিয়ে সাত সাগর পেরিয়ে বেতারে মানুষের চেহারা আর কণ্ঠস্বর ছোটাছুটি করে, ছবি জ্যান্ত হয়ে কথা কয়, রসায়নাগারে নূতন জীবের সৃষ্টি হয়, কিছুকাল আগেও এসব ছিল সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে, আজগুবি কল্পনার মতো। তবু আমরা কতটুকুই বা দেখতে কি জানতে পেরেছি? পৃথিবীতে যা-কিছু আমরা দেখিনি-শুনিনি তাহাই অসম্ভব না হতেও পারে!

আপনার বক্তৃতাটি যে খুবই শিক্ষাপ্রদ, তা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু আপাতত বক্তৃতা শোনবার আগ্রহ আমার নেই। এখন আমরা কি করব সেইটেই ভাবা উচিত, এ-দ্বীপ আমাদের নিয়ে জলপথে হয়তো নিরুদ্দেশ যাত্রা করতে চায়, এখন আমাদের কি করা উচিত?

কুমার বললে, আমাদের উচিত, জলে ঝাঁপ দেওয়া।

জয়ন্ত বললে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে যদি তরল জল আবার কঠিন মৃত্তিকায় পরিণত হয়, তাহলেও আমি আর অবাক হব না!

বিমল বললে, কিংবা জলের ভেতরে আবার দেখা দিতে পারে দলে-দলে জ্যান্ত মড়া!

কুমার শিউরে উঠে ব্যাগটা টিপেটুপে অনুভব করে দেখলে, লাউ-জুর মূর্তিটা যথাস্থানে আছে কি না!

তারপর এগিয়ে ধারে গিয়ে তারা দেখলে, দ্বীপ তখন ছুটে চলেছে রীতিমতো বেগে এবং তটের তলায় উচ্ছল স্রোত ডাকছে কলকল করে! নদীর আকার তখন চওড়া হয়ে উঠেছে এবং খণ্ডদ্বীপের দুই দিকে দুই তীর সরে গেছে অনেক দূরে।

জয়ন্ত আবার বললে, এখন উপায় কি বিমলবাবু, কী আমরা করব?

বিমল বললে, এখানে জল-স্থল দুই-ই বিপদজনক। বাকি আছে শূন্যপথ, কিন্তু আমাদের ডানা নেই!

কুমার বললে, নদীর সঙ্গে আমরা যাচ্ছি সমুদ্রের দিকে। হয়তো অমৃত-দ্বীপের বাসিন্দারা আমাদের মতো অনাহুত অতিথিদের বাহির-সমুদ্রে তাড়িয়ে দিতে চায়।

জয়ন্ত আশান্বিত হয়ে বললে, তাহলে তো সেটা হবে আমাদের পক্ষে শাপে বর! নদীর মুখেই আছে আমাদের জাহাজ!

বিমল বললে, কিন্তু জাহাজ শুদ্ধ লোক আমাদের এই অতুলনীয় দ্বীপ-নৌকা দেখে কি মনে করবে, সেটা ভেবে এখন থেকেই আমার হাসি পাচ্ছে!

কিন্তু বিমলের মুখে হাসির আভাস ফোটবার আগেই হাসি ফুটল আর এক নতুন কণ্ঠে। দস্তুরমত কৌতুক-হাসি!

সকলে চমকে পেছন ফিরে অবাক হয়ে দেখলে, একটু তফাতে বনের সামনে গাছতলায় বসে আছে আবার এক অমানুষিক মুর্তি! কিন্তু এবারে তার মুখ আর ভাবহীন নয়, কৌতুক হাস্যে সমুজ্জ্বল।

জয়ন্ত বললে, এ-মূর্তি আবার কোথা থেকে এল?

বিমল বললে, যেখান থেকেই আসুক, এর চোখে-মুখে বিভীষিকার চিহ্ন নেই, এ হয়তো আমাদের ভয় দেখাতে আসেনি।

মূর্তি পরিষ্কার ইংরেজি ভাষায় বললে, কে তোমরা? পরেছ ইংরেজি পোশাক, কিন্তু দেখছি তোমরা ইংরেজ নও!

বিমল দুই পা এগিয়ে বললে, তুমি যেমন চিনা হয়েও ইংরেজি বলছ, আমরাও তেমনি ইংরেজি পোশাক পরেও জাতে ভারতীয়!

–ঋষি বুদ্ধদেবের দেশ থেকে তোমরা প্রভু লাউ-জুর দেশে এসেছ কেন? তোমরা কি জানো না, এ-দেশ হচ্ছে পৃথিবীর স্বর্গ, এখানে বাস করে আমার মতন অমরেরা জলে স্থলে-শূন্যে যাদের অবাধ গতি? এখানে নশ্বর মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ!

বিমল হেসে বললে, অমর হওয়ার জন্যে আমার মনে একটুও লোভ নেই!

মূর্তি উপেক্ষার হাসি হেসে বললে, মুখ! আমাদের দেহের মর্যাদা তোমরা বুঝবে না! দেহ তো একটা তুচ্ছ খোলস মাত্র, মানুষ বলতে আসলে বোঝায় মানুষের মনকে। আমাদের দেহ নামে মাত্র আছে, কিন্তু আমরা করি কেবল মনের সাধনা, আমাদের আড়ষ্ট দেহে কর্মশীল কেবল আমাদের মন। কিন্তু থাক ওসব কথা। কে তোমরা? কেন এখানে এসেছ? সিয়েন হতে?

না। তোমাদের দেখবার পর আর অমর হওয়ার সাধ নেই। আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি।

বেড়াতে! এটা নশ্বর মানুষের বেড়াবার জায়গা নয়! জানো, তোমাদের মতো আরও কত কৌতূহলী এখানে বেড়াতে এসে মারা পড়েছে আমাদের হাতে?

সেটা তোমাদের অভ্যর্থনার পদ্ধতি দেখেই বুঝতে পেরেছি। কেবল আমাদের মারতে পারোনি, কারণ, সে শক্তি তোমাদের নেই!

মূর্খ! তোমাদের বধ করতে পারি এই মুহূর্তেই! কেবল প্রভু লাউ-জুর পবিত্র মূর্তি তোমাদের সঙ্গে আছে বলেই এখনও তোমরা বেঁচে আছ। ও-মূর্তি কোথায় পেলে?

সে খবর তোমাকে দেব না।

তোমরা কি তাও-ধর্মে দীক্ষা নিয়েছ?

না। আমরা হিন্দু। তবে সাধক বলে লাউ-জুকে আমরা শ্রদ্ধা করি।

কেবল মুখের শ্রদ্ধা ব্যর্থ, তোমাদের মন অপবিত্র। প্রভু লাউ-জুর মূর্তির মহিমায় তোমাদের প্রাণরক্ষা হল বটে, কিন্তু এখানে আর তোমাদের ঠাঁই নেই। শীঘ্র চলে যাও এখান থেকে!

খুব লম্বা হুকুম তো দিলে, এই জ্যান্ত মড়ার মুল্লুক থেকে চলেও তো যেতে চাই, কিন্তু যাই কেমন করে?

কেন?

আগে ছিলুম মাঠে। তারপর মাঠ হল জলে-ঘেরা দ্বীপ। তারপর দ্বীপ হল আশ্চর্য এক নৌকো। খুব মজার ম্যাজিক দেখিয়ে আরব্য উপন্যাসকেও তো লজ্জা দিলে বাবা, এখন দয়া করে দ্বীপনৌকোকে আবার স্থলের সঙ্গে জুড়ে দাও দেখি, আমরাও ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই।

তোমার সুবুদ্ধি দেখে খুশি হলুম। দ্বীপের পূর্বদিকে চেয়ে দ্যাখো।

সকলে বিপুল বিস্ময়ে ফিরে দেখলে, ইতিমধ্যে কখন যে দ্বীপের পূর্ব-প্রান্ত আবার মাঠের সঙ্গে জুড়ে এক হয়ে গেছে তারা কেউ জানতেও পারেনি! স্থির মাটি, পায়ের তলায় আর টলমল করছে না।

এতক্ষণ পরে বিমল শ্রদ্ধাপূর্ণস্বরে বললে, তোমাকে শতশত ধন্যবাদ!

এখান থেকে সোজা পশ্চিম দিকে গেলেই দেখবে, নদীর ধারে তোমাদের নৌকো বাঁধা আছে। যাও!

পরমুহূর্তেই আর-এক অদ্ভুত দৃশ্য! সেই উপবিষ্ট মূর্তি আচম্বিতে বিনা অবলম্বনেই শূন্যে ঊর্ধ্বদিকে উঠল এবং তারপর ধনুক থেকে ছোঁড়া তিরের মতন বেগে বনের ওপর দিয়ে কোথায় চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেল!

কুমার হতভম্বের মতন বললে, এ কি দেখলুম বিমল, এ কি দেখলুম!

বিমল বললে, আমি কিন্তু এই শেষ ম্যাজিকটা দেখে আশ্চর্য বলে মনে করছি না!

জয়ন্ত বললে, বিমলবাবু, তাহলে আপনার কাছে আশ্চর্য বলে কোনও কিছুই নেই!

জয়ন্তবাবু, আপনি কি সেই অদ্ভুত ইংরেজের কথা শোনেননি টলষ্টয়, থ্যাকারের সঙ্গে আরও অনেক বিশ্ববিখ্যাত লোক স্বচক্ষে দেখে যার বর্ণনা করে গেছেন? তিনি সাধকও নন, যাদুকরও নন, আমাদেরই মতন সাধারণ মানুষ। কিন্তু তার দেহ শুন্যে উঠে এক জানলা দিয়ে। শূন্যপথেই আবার ঘরের ভেতরে ফিরে আসত!

দোহাই মশাই, দোহাই! আর নতুন-নতুন দৃষ্টান্ত দিয়ে অসম্ভবের স্বাভাবিক ব্যাখ্যা করবেন! আপনাদের অ্যাডভেঞ্চার আমার ধারণার বাইরে। এখানকার মাটিতে আর পাঁচ মিনিট দাঁড়ালেও আমার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে! মাঠ আবার দ্বীপ হওয়ার আগেই ছুটে চলুন নৌকোর খোঁজে।

সকলে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হল। পূর্বাকাশের রংমহলে প্রবেশ করেছে তখন নবীন সূর্য। নদীর জল যেন গলানো সোনার ধারা। নৌকো যথাস্থানেই বাঁধা আছে।

অমৃত-দ্বীপের আরও কত রহস্য অমৃত-দ্বীপের ভেতরেই রেখে তারা খুলে দিলে নৌকার বাঁধন।